# আল মু'মিনূন

## ২৩

### নামকরণ

প্রথম আয়াত قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

### নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়। প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫–৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মক্কী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীর বরাত দিয়ে হযরত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী (সা) বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্‌রে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

### বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

রসূলের আনুগত্য করার আহবান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র ভাষণটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত।

বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ যারা এ নবীর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভের যোগ্য হয়।

এরপর মানুষের জন্ম, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যে, এ নবী তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরন্তন সত্যগুলো তোমাদের মেনে নিতে বলছেন তোমাদের নিজেদের সত্তা এবং এই সমগ্র বিশ্ব–ব্যবস্থা সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে।

তারপর নবীদের ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো কাহিনী মনে হলেও মূলত এ পদ্ধতিতে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছে ঃ

এক ঃ আজ তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন করছো সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও যেসব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে থাকো, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে তাঁদের যুগে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা এ একই আপত্তি করেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উত্থাপনকারীরা সত্যপথে ছিল, না নবীগণ?

দুই ঃ তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা দিচ্ছেন এই একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোন অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনো শুনেনি।

তিন ঃ যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং তাঁদের বিরোধিতার ওপর জিদ ধরেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চার ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী একই জাতি বা উম্মাহভুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ছাড়া অন্য যেসব বিচিত্র ধর্মমত তোমরা দুনিয়ার চারদিকে দেখতে পাচ্ছো এগুলো সবই মানুষের স্বকপোলকল্পিত। এর কোনটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এ কাহিনীগুলো বলার পর লোকদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক পথের অনুসারী হবার নিশ্চিত আলামত হতে পারে। এর মাধ্যমে একথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়। অনুরূপভাবে কারোর গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি বিরূপ। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহ ভীতি ও সততা। এরি ওপর তার আল্লাহর প্রিয় অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। একথাগুলো এজন্যে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল তার সকল নায়কই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা নিজেরাও এ আত্মম্ভরিতায় ভুগছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন লোকেরাও এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা একনাগাড়ে সামনের দিকে এগিয়েই চলছে তাদের ওপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজর রয়েছে। আর এ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত লোকেরা যারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আছে এদের নিজেদের অবস্থাই তো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের কোপ তো এদের ওপর পড়েই আছে।

এরপর মক্কাবাসীদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাসী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ নাযিল হয়েছে এটা একটা সতর্ক বাণী। এ দেখে তোমরা

নিজেরা সংশোধিত হয়ে যাও এবং সরল সঠিক পথে এসে যাও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। নয়তো এরপর আসবে আরো কঠিন শাস্তি, যা দেখে তোমরা আর্তনাদ করতে থাকবে।

তারপর বিশ্ব-জাহানেও তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট করা হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো। এই নবী যে তাওহীদ ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য ও স্বরূপ তোমাদের জানাচ্ছেন চারদিকে কি তার সাক্ষদানকারী নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে নেই? তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি কি তার সত্যতা ও নির্ভুলতার সাক্ষ দিচ্ছে না?

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমার সাথে যাই ব্যবহার করে থাকুক না কেন তুমি ভালোভাবে তাদের প্রত্যুত্তর দাও। শয়তান যেন কখনো তোমাকে আবেগ উচ্ছল করে দিয়ে মন্দের জবাবে মন্দ করতে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ না পায়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে আখেরাতে জবাবদিহির ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের আহবায়ক ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যা করছো সেজন্য তোমাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤

*নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা[১] যারা ঃ*

*নিজেদের[২] নামাযে বিনয়াবনত[৩] হয়,*

*বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে,[৪]*

*যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে,[৫]*

১. মু'মিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছে এবং তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে চলতে রাজি হয়েছে।

মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালাহ'। ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি, লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। যেমন أَفْلَحَ الرَّجُلُ মানে হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজের লক্ষে পৌছে গেছে, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে গেছে, তার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে, তার অবস্থা ভালো হয়ে গেছে।

قَدْ أَفْلَحَ "নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে।" এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গুঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ। তাদের ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন–দওলত। বৈষয়িক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা। তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ–কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধিতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিশ্চিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এথেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদণ্ড ভুল, তোমাদের অনুমান ক্রটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো

তা আসলে সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. এখান থেকে নিয়ে ৯ আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ। অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী তারা কেনইবা সফল হবে না। এ গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে। তারাই যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে।

৩. মূল শব্দ হচ্ছে "খুশূ"। এর আসল মানে হচ্ছে কারোর সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের খুশূ' হচ্ছে, মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কন্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। নামাযে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে, সে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, لوخشع قلبه خشعت جوارحه "যদি তার মনে খুশূ' থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশূ'র সঞ্চার হতো।"

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে এখনই জানা গেলো, তবুও শরীয়াতে নামাযের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডাইনে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত। কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত।) নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভংগীতে

খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধমকের সুরে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে গান গাওয়াও নামাযের নিয়ম বিরোধী; জোরে জোরে আড়মোড়া ভাংগা ও ঢেকুর তোলাও নামাযের মধ্যে বেআদবী হিসেবে গণ্য। তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে নামাযের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা–ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে। এ সময়ের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

৪. মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়—সেগুলো সবই 'বাজে' কাজের অন্তরভুক্ত।

"مُعْرِضُوْنَ" শব্দের অনুবাদ করেছি 'দূরে থাকে'। কিন্তু এতটুকুতে সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ হয় না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ করতে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

"যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" (আল ফুরকান, ৭২ আয়াত)

এ ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। মু'মিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময় দায়িত্বানুভূতি সজাগ থাকে, সে মনে করে দুনিয়াটা আসলে একটা পরীক্ষাগৃহ। যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে একটি মাপাজোকা মেয়াদ। তাকে পরীক্ষা করার জন্য এ সময়–কালটি দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি

পরীক্ষার হলে বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যস্ততা সহকারে তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেয়, এ অনুভূতিও ঠিক তেমনি মু'মিনকে গুরুত্ব ও ব্যস্ততা সহকারে নিমগ্ন করে দেয়। সেই ছাত্রটি যেমন অনুভব করে পরীক্ষার এ ঘন্টা ক'টি তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনুভূতির কারণে সে এ ঘন্টাগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেণ্ডও বাজে কাজে নষ্ট করতে চায় না, ঠিক তেমনি মু'মিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরি করে। তার দৃষ্টিতে সময় 'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয়। অন্য কথায়, সময় কাটানোর জিনিস নয়—কাজে 'খাটানোর' জিনিস।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শান্ত–সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র–পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গপ্ মারা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাংগ, কৌতুক, ও হাল্‌কা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা–তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা–মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ–স্ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি–গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান–বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً " সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।"

৫. "যাকাত দেয়া" ও "যাকাতের পথে সক্রিয় থাকা"র মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে। একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়। এটা নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যবহ যে, এখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভংগী পরিহার করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ এর অপ্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে "পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি" এবং দ্বিতীয়টি "বিকাশ সাধন"—কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং তার মৌল উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়। তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ হয়। এক, এমন ধন–সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি। যদি يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٧﴾

*নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে,[৬] নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না; তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী,[৭]*

শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার পরিশুদ্ধি চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনুবাদ হবে তারা পরিশুদ্ধির কার্য সম্পাদনকারী লোক।" অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যেও মৌল মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'লায় বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে।"

সূরা শামসে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে।"

কিন্তু এ দু'টির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। কারণ এ দু'টি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়াতটি স্বয়ং শুদ্ধিকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সত্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে।

৬. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না। দুই, তারা নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং

কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। (আরো ব্যাখার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৩০–৩২ টীকা।)

৭. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" বাক্যাংশটি থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এ বাক্যটি বলা হয়েছে। দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। যদি কেবল মাত্র "সফলতা লাভকারী মু'মিনরা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভ্রান্তিটি জোরদার হয়ে যেতো। কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে–শাদীর ঝামেলায় তারা যায় না। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ।

এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়। এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

এক ঃ লজ্জাস্থান হেফাজত করার সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের স্ত্রীলোককে বাদ দেয়া হয়েছে। এক, স্ত্রী। দুই, مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ । স্ত্রী ( ازواج ) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত "স্ত্রী" শব্দটি এরি সমার্থবোধক। আর مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ বলতে যে বাঁদী বুঝায় আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার উভয়ই তার সাক্ষী। অর্থাৎ এমন বাঁদী যার ওপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। এভাবে এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা। যদি এ জন্যও বিয়ে শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত হতো। বর্তমানকালের কোন কোন মুফাস্সির যারা বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগ স্বীকার করেননি তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ। আয়াতটি থেকে যুক্তি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ সেখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি আর্থিক দুরবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে কোন বাঁদীকে বিয়ে করো। কিন্তু এসব লোকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো। এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্য বিরোধী হয় তাকে জেনে বুঝে বাদ দিয়ে দেন। এ আয়াতে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"কাজেই এ বাঁদীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং এদেরকে এদের পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো।" এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে বাঁদীর মালিকের বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করতে চায়। নয়তো যদি নিজেরই বাঁদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ "অভিভাবক" কে হতে পারে যার কাছ থেকে তার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়? কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুককারীরা কেবলমাত্র فَانْكِحُوْهُنَّ –কে গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন অর্থ বের করেন যা এ একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। কোন ব্যক্তি যদি নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সূরা নিসার ৩–৩৫, সূরা আহযাবের ৫০–৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মুমিনূনের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে। (এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪ টীকা; তাফহীমাত (মওদূদী রচনাবলী) ২য় খণ্ড ২৯০ থেকে ৩২৪ পৃঃ এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড, ৩২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

দুই : اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যাংশে عَلٰى শব্দটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনুসংগিক বাক্যে আইনের যে ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সংগে। বাকি قَدْاَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে নিয়ে خٰلِدُوْنَ পর্যন্ত পুরো আয়াতটিতেই সর্বনাম পুং লিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখন সর্বনামের উল্লেখ পুং লিংগেই করা হয়। কিন্তু এখানে لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ এর হুকুমের বাইরে রেখে عَلٰى শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যতিক্রমটি পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। যদি "এদের কাছে" না বলে "এদের থেকে" হেফাজত না করলে তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হুকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে পারতো। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝার কারণে হযরত উমরের (রা) যুগে জনৈকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন সম্ভোগ করে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শূরায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক বাক্যে বললেন : تاولت كتاب الله تعالى غير تاويله অর্থাৎ "সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে।" এখানে কারোর মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীরা কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে,

যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে পুরুষাংগ হেফাজত করার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে তখন নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই এ হুকুমের বাইরে চলে গেছে। এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি। এভাবে এ ব্যতিক্রমের হুকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মলিকানাধীন নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়। নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালক হতে পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শৃংখল ঢিলা থেকে যায়।

তিন ঃ "তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী"–এ বাক্যটি ওপরে উল্লেখিত দু'টি বৈধ আকার ছাড়া যিনা বা সমকাম অথবা পশু–সংগম কিংবা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে। একমাত্র হস্তমৈথুনের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একে জায়েয গণ্য করেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে চূড়ান্ত হারাম বলেন। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম তবুও তারা বলেন, যদি চরম মুহূর্তে কখনো কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে।

চার ঃ কোন কোন মুফাস্‌সির মুতা' বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যে মেয়েকে মুতা' বিয়ে করা হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত, না বাঁদীর। বাঁদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট, আবার স্ত্রীও নয়। কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার ওপর আরোপিত হয় না। সে পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয় না। তার জন্য ইদ্দত নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং ঈলা, যিহার ও লি'আন ইত্যাদি কোনটিই নেই। বরং সে চার স্ত্রীর নির্ধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে। কাজেই সে যখন "স্ত্রী" ও "বাঁদী" কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন নিশ্চয়ই সে 'এর বাইরে আরো কিছু'র মধ্যে গণ্য হবে। আর এ আরো কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন সীমালংঘনকারী গণ্য করেছে। এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী। তবে এর মধ্যে একটি দুর্বলতার দিকও আছে। আর এ দুর্বলতার কারণে এ আয়াতটির বলেই যে, মুতা' হারাম হয়েছে সে কথা বলা কঠিন। এ দুর্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা' হারাম হবার শেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা বিজয়ের বছরে। এর পূর্বে অনুমতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, মুতা' হারাম হবার হুকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী নির্ভুল যে, মুতা' বিয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে। সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট

ফায়সালা না থাকতো তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হওয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল। মুতা'র আলোচনা যখন এসে গেছে তখন আরো দু'টি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়। এক, এর হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত। কাজেই হযরত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, একথা বলা ঠিক নয়। হযরত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্তক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী। যেহেতু এ হুকুমটি রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ লোকদের কাছে এটি পৌঁছেনি তাই হযরত উমর (রা) এটিকে সাধারণ্যে প্রচার ও আইনের সাহায্যে কার্যকরী করেছিলেন। দুই, শীয়াগণ মুতা'কে সর্বতোভাবে ও শর্তহীনভাবে মুবাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই। প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেঈ ও ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তাঁরা শুধুমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন। তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্তহীন মুবাহ এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি। বৈধতার প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে পেশ করা হয় হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) নাম। তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন : ما هي الا كالميتة لا تحل الا للمضطر (এ হচ্ছে মৃতের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তার ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ নয়।) আবার তিনি যখন দেখলেন তাঁর এ বৈধতার অবকাশ–দানমূলক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে যথেচ্ছভাবে মুতা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মুলতবী করছে না তখন তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন। ইবনে আব্বাস ও তাঁর সমমনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত গ্রহণকারীরা বড় জোর "ইযৃতিরার" তথা অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থায় একে বৈধ বলতে পারেন। অবাধ ও শর্তহীন মুবাহ এবং প্রয়োজন ছাড়াই মুতা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মুতা–বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্ভোগ করা এমন একটি সেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ রুচিবোধও কোনদিন বরদাশত করে না। ইসলামী শরীয়াত ও রসূল বংশোদ্ভুত ইমামদেরকে এর সাথে জড়িত মনে করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি মনে করি, শীয়াদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ও রুচিবান ব্যক্তিও তার মেয়ের জন্য কেউ বিবাহের পরিবর্তে মুতা'র প্রস্তাব দেবে এটা বরদাশত করতে পারেন না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুতা'র বৈধতার জন্য সমাজে বারবনিতাদের মতো মেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মুতা' করার অবাধ সুযোগ থাকে। অথবা মুতা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কন্যা ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করার অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহ ও রসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ ও ইনসাফবিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে কি এটাও আশা করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মুবাহ করে দেবেন যাকে যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে নিজের জন্য অমর্যাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۭ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

*নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে*[৮]

*এবং নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে,*[৯]

*তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস*[১০] *লাভ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।*[১১]

৮. "আমানত" শব্দটি বিশ্ব–জাহানের প্রভু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত কাউকে সোপর্দ করেছেন তা সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এমন যাবতীয় চুক্তি প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তরভুক্ত হয় যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও মানুষের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মু'মিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

"যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দীনদারী নেই।" (বাইহাকী, ঈমানের শাখা–প্রশাখাসমূহ)

বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মুনাফিকীর একটি অভ্যাস হিসেবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে, কখনো কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভংগ করে এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই (নৈতিকতা ও সততার) সমস্ত সীমা লংঘন করে।"

৯. ওপরের খুশূ'র আলোচনায় নামায শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে "নামাযগুলো" বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ ছিল মূল নামায আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের নামায সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। "নামাযগুলোর সংরক্ষণ"–এর অর্থ হচ্ছে ঃ সে নামাযের সময়, নামাযের নিয়ম–কানুন, আরকান ও আহকাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের

প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে। শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে। অযু ঠিক মতো করে। কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে। সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে। সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাঁধা বাক্য আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুঁকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

১০. ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কুলদানী ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা, হিব্রু ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ, সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস, ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদৌস। এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাঁচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয়, মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আংগুর পাওয়া যায়। বরং কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বুঝা যায় যে, এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু-পাখিও পাওয়া যায়। কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায়ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে ঃ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে।" এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ-বাগিচা-উদ্যান রয়েছে।

মু'মিনদের ফিরেদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা-হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আম্বিয়ায় (৯৯ টীকা) যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতগুলোতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ যারাই কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনুসারী হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রেরই হোক না কেন অবশ্যই তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

দুই ঃ সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা, অথবা নিছক সচ্চরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল। মানুষ যখন আল্লাহর পাঠানো পথনির্দেশ মেনে চলে এবং তারপর সে অনুযায়ী নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা লাভ করে।

তিন ঃ নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালিতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। বরং তা একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ায় ও আখেরাতে

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

*আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে,[১২] তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে।[১৩] কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন,[১৪] সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি। এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।*

*আর তোমাদের ওপর আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি,[১৫] সৃষ্টিকর্ম আমার মোটেই অজানা ছিল না।[১৬] আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি।[১৭] আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি।[১৮]*

স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিকেই এ নামে অভিহিত করা হয়। এটি ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া অর্জিত হয় না। পথভ্রষ্টদের সাময়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ মুমিনদের সাময়িক বিপদ আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না।

চার ঃ মু'মিনদের এ গুণাবলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার এ বিষয়বস্তুটিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে। তৃতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ

ভাষণটির যুক্তির ধারা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শুরুতে আছে অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি। অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন, চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এ শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরনের কল্যাণময় ফল কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ যুক্তি। অর্থাৎ মানুষের নিজের সত্তায় ও চারপাশের বিশ্বে যে নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আখেরাতের এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। তারপর আসে ঐতিহাসিক যুক্তির কথা। এ যুক্তিগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয় বরং একই কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে। এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে।

১২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা হজ্জের ৫, ৬ ও ৯ টীকা দেখুন।

১৩. অর্থাৎ কোন মুক্তমনের অধিকারী ব্যক্তি শিশুকে মাতৃগর্ভে লালিত পালিত হতে দেখে একথা ধারণাও করতে পারে না যে, এখানে এমন একটি মানুষ তৈরী হচ্ছে, যে বাইরে এসে জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকর্মের এসব নৈপূণ্য দেখাবে এবং তার থেকে এ ধরনের বিস্ময়কর শক্তি ও যোগ্যতার প্রকাশ ঘটবে। সেখানে সে হয় হাড় ও রক্ত মাংসের একটি দলা পাকানো পিণ্ডের মতো। তার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত জীবনের প্রারম্ভিক বৈশিষ্টসমূহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তার মধ্যে থাকে না শ্রবণ শক্তি, থাকে না দৃষ্টি শক্তি, বাকশক্তি, বুদ্ধি–বিবেচনা ও অন্য কোন গুণ। কিন্তু বাইরে এসেই সে অন্য কিছু হয়ে যায়। পেটে অবস্থানকারী ভ্রূণের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না। অথচ এখন সে শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও বাকশক্তির অধিকারী একটি সত্তা। এখন সে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। এখন তার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটার সূচনা হয় যে জাগ্রত হবার পরপরই প্রথম মুহূর্ত থেকেই নিজের আওতাধীন প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। তারপর সে যতই এগিয়ে যেতে থাকে তার সত্তা থেকে এ "অন্য জিনিস" হবার অবস্থা আরো সুস্পষ্ট ও আরো বিকশিত হতে থাকে। যৌবনে পদার্পণ করে শৈশব থেকে ভিন্ন কিছু হয়ে যায়। পৌঢ়ত্বে পৌঁছে যৌবনের তুলনায় অন্য কিছু প্রমাণিত হয়। বার্ধক্যে উপনীত হবার পর নতুন প্রজন্মের জন্য একথা অনুমান করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, তার শিশুকাল কেমন ছিল এবং যৌবনকালে কি অবস্থা ছিল। এত বড় পরিবর্তন অন্তত এ দুনিয়ার অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে ঘটে না। কোন ব্যক্তি যদি একদিকে কোন বর্ষীয়ান পুরুষের শক্তি, যোগ্যতা ও কাজ দেখে এবং অন্য দিকে একথা কল্পনা করতে থাকে যে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একদা যে একটি ফোঁটা মায়ের গর্ভকোষে টপ্‌কে পড়েছিল তার মধ্যে এত সবকিছু নিহিত ছিল, তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে সে একই কথা বের হয়ে আসবে যা সামনের দিকের বাক্যের মধ্যে আসছে।

১৪. মূলে تَبٰرَكَ اللّٰهُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর সমগ্র গভীর অর্থ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আভিধানিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর মধ্যে দু'টি অর্থ

পাওয়া যায়। এক, তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। দুই, তিনি এমনই কল্যাণ ও সদগুণের অধিকারী যে, তাঁর সম্পর্কে তোমরা যতটুকু অনুমান করবে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁকে পাবে। এমনকি তাঁর কল্যাণের ধারা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ১ ও ১৯ টীকা) এ দু'টি অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে একথা বুঝা যাবে যে, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করার পর فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ বাক্যাংশটি নিছক একটি প্রশংসামূলক বাক্যাংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি বরং এটি হচ্ছে যুক্তির পরে যুক্তির উপসংহারও। এর মধ্যে যেন একথাই বলা হচ্ছে যে, যে আল্লাহ একটি মাটির টিলাকে ক্রমোন্নত করে একটি পূর্ণ মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেন তিনি প্রভুত্বের ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ শরীক হবে এ থেকে অনেক বশী পাক–পবিত্র ও উর্ধে। তিনি এ একই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন, কি পারেন না এরূপ সন্দেহ–সংশয় থেকে অনেক বেশী পাক–পবিত্র। আর তিনি একবারই মানুষ সৃষ্টি করে দেবার পর তাঁর সব নৈপুণ্য খতম হয়ে যায় এবং এরপর তিনি আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ ক্ষমতা সম্পর্কে এটা বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা।

১৫. মূলে طَرَائِقَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে পথও হয় আবার স্তরও হয়। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে সম্ভবত এর অর্থ হবে সাতটি গ্রহের আবর্তন পথ। আর যেহেতু সে যুগে মানুষ সাতটি গ্রহ সম্পর্কেই জানতো তাই সাতটি পথের কথা বলা হয়েছে। এর মানে অবশ্যই এ নয় যে, এগুলো ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে سَبْعَ طَرَائِقَ এর অর্থ তাই হবে যা سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে) এর অর্থ হয়। আর এই সংগে যে বলা হয়েছে "তোমাদের ওপর" আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি, এর একটি সহজ সরল অর্থ হবে তাই যা এর বাহ্যিক শব্দগুলো থেকে বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি হবে, তোমাদের চাইতে বড় জিনিস আমি নির্মাণ করেছি এ আকাশ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চাইতে অনেক বড় কাজ।"
(আল মু'মিন, ৫৭ আয়াত)

১৬. অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে, "আর সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে আমি গাফিল ছিলাম না অথবা নই।" মূল বাক্যে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হয় ঃ এসব কিছু যা আমি বানিয়েছি এগুলো এমনি হঠাৎ কোন আনাড়ির হাত দিয়ে আন্দাজে তৈরী হয়ে যায়নি। বরং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ জ্ঞান সহকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইন সক্রিয় রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যে একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিশাল কর্ম জগতে ও বিশ্ব–জগতের এ সুবিশাল কারখানায় সব দিকেই একটি উদ্দেশ্যমুখিনতা দেখা যাচ্ছে। এসব স্রষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ পেশ করছে। দ্বিতীয় অনুবাদটি গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে ঃ এ বিশ্ব–জাহানে আমি যা কিছুই সৃষ্টি করেছি

তাদের কারোর কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো গাফিল এবং কোন অবস্থা থেকে কখনো বেখবর থাকিনি। কোন জিনিসকে আমি নিজের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তৈরী হতে ও চলতে দেইনি। কোন জিনিসের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সরবরাহ করতে আমি কখনো কুন্ঠিত হইনি। প্রত্যেকটি বিন্দু, বালুকণা ও পত্র–পল্লবের অবস্থা আমি অবগত থেকেছি।

১৭. যদিও এর অর্থ হতে পারে মওসুমী বৃষ্টিপাত কিন্তু আয়াতের শব্দ বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে অন্য একটি অর্থও এখান থেকে বুঝা যায়। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ একই সংগে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে নাযিল করেছিলেন যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রহটির প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে রক্ষিত হয়েছে। এর সাহায্যে সাগর ও মহাসাগরের জন্ম হয়েছে এবং ভূগর্ভেও পানি (Sub-soil water) সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পানিই ঘুরে ফিরে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী–নালা ঝরণা ও কুয়া এ পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে এরি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তার মূল ভাণ্ডারের দিকে ফিরে যায়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পানির এ ভাণ্ডার এক বিন্দুও কমেনি এবং এক বিন্দু বাড়াবারও দরকার হয়নি। এর চাইতেও বেশী আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রই একথা জানে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির উৎপত্তি হয়েছে। একবার এত বিপুল পরিমাণ পানি তৈরী হয়ে গেছে যে, এর সাহায্যে সমূদ্র ভরে গেছে এবং এখন এর ভাণ্ডারে এক বিন্দুও বাড়ছে না। কে তিনি যিনি এক সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে এ অথৈ পানির ভাণ্ডার সৃষ্টি করে দিয়েছেন? আবার কে তিনি যিনি এখন আর এ দু'টি গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হয়, অথচ এ দু'টি গ্যাস এখনো দুনিয়ার বুকে মওজুদ রয়েছে? আর পানি যখন বাষ্প হয়ে বাতাসে উড়ে যায় তখন কে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে বাধা দেয়? নাস্তিক্যবাদীদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে? আর যারা পানি ও বাতাস এবং উষ্ণতা ও শৈত্যের পৃথক পৃথক সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে?

১৮. অর্থাৎ তাকে অদৃশ্য করার কোন একটাই পদ্ধতি নেই। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে যে কোনটিকে আমরা যখনই চাই ব্যবহার করে তোমাদেরকে জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি থেকে বঞ্চিত করতে পারি। এভাবে এ আয়াতটি সূরা মুল্‌কের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে যেখানে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ

"তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যমীন যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে শুষে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঝরণাধারা এনে দেবে।"

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْـَٔاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

*তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুস্বাদু ফল[১৯] এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো।[২০] আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি[২১] তা তেল উৎপন্ন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও।*

*আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যাকিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই[২২] এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও আছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো এবং তাদের ওপর ও নৌযানে আরোহণও করে থাকো।[২৩]*

১৯. অর্থাৎ খেজুর ও আংগুর ছাড়াও আরো নানান ধরনের ফল–ফলাদি।

২০. অর্থাৎ এসব বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ফল, শস্য, কাঠ এবং অন্যান্য যেসব দ্রব্য তোমরা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করো, এসব থেকে তোমরা নিজেদের জন্য জীবিকা আহরণ করো। مِنْهَا تَأْكُلُونَ (যেগুলো থেকে তোমরা খাও) এর মধ্যে যে "যেগুলো" শব্দটি রয়েছে এটির মাধ্যমে বাগানগুলো বুঝানো হয়েছে, ফল–ফলাদি নয়। আর تَأْكُلُونَ মানে শুধু এই নয় যে, এ বাগানগুলোর ফল তোমরা খাও বরং এ শব্দটি সামগ্রিকভাবে জীবিকা অর্জন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি নিজের অমুক কাজের ভাত খাচ্ছে, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায়ও বলা হয় فلان ياكل من حرفته (অমুক ব্যক্তি তার শিল্পকর্ম থেকে খাচ্ছে অর্থাৎ তার শিল্পকর্ম থেকে জীবিকা অর্জন করছে)।

২১. এখানে জয়তুনের কথা বলা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ গাছগুলো দেড় হাজার দু'হাজার বছর বাঁচে। এমনকি ফিলিস্তিনের কোন কোন গাছের দৈর্ঘ, স্থূলতা ও বিস্তার দেখে অনুমান করা হয়

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২ রুকূ'

*আমি নূহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে।[২৪] সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না?[২৫] তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ।[২৬] এর লক্ষ হচ্ছে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।[২৭] আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেশতা পাঠাতেন।[২৭(ক)] একথা তো আমরা আমাদের বাপদাদাদের আমলে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রসূল হয়ে আসে)। কিছুই নয়, শুধুমাত্র এ লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছে; কিছু দিন আরো দেখে নাও (হয়তো পাগলামি ছেড়ে যাবে)।"*

যে, সেগুলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। সিনাই পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশ ভূমি।

২২. অর্থাৎ দুধ। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত ও গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস। পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

২৩. গবাদি পশু ও নৌযানকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরববাসীরা আরোহণ ও বোঝা বহন উভয় কাজের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উট ব্যবহার করতো এবং উটের জন্য "স্থল পথের জাহাজ" উপমাটি অনেক পুরানো। জাহেলী যুগের কবি যুররুম্মাহ বলেন ঃ

سفينة بر تحت خدى زمامها

"স্থলপথের জাহাজ চলে আমার গণ্ডদেশের নিচে তার লাগামটি।"

২৪. তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন আল আ'রাফের ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুসের ৭১ থেকে ৭৩; হূদের ২৫ থেকে ৪৮; বনী ইসরাঈলের ৩ এবং আল আম্বিয়ার ৭৬–৭৭ আয়াত।

২৫. অর্থাৎ নিজেদের আসল ও যথার্থ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করতে তোমাদের ভয় লাগে না? যিনি তোমাদের ও সারা জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসক তাঁর রাজ্যে বাস করে তাঁর পরিবর্তে অন্যদের বন্দেগী ও আনুগত্য করার এবং অন্যদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নেবার ফলাফল কি হবে সে ব্যাপারে কি তোমাদের একটুও ভয় নেই?

২৬. মানুষ নবী হতে পারে না এবং নবী মানুষ হতে পারে না, এ চিন্তাটি সর্বকালের পথভ্রষ্ট লোকদের একটি সম্মিলিত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন বারবার এ জাহেলী ধারণাটির উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ করেছে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে একথা বর্ণনা করেছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং মানুষদের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া উচিত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল আ'রাফ, ৬৩–৬৯; ইউনুস, ২; হূদ, ২৭–৩১; ইউসুফ, ১০৯; আর রা'দ, ৩৮; ইবরাহীম, ১০–১১; আন নাম্‌ল, ৪৩; বনী ইসরাঈল, ৯৪–৯৫; আল কাহাফ, ১১০; আল আম্বিয়া, ৩–৩৪; অল মু'মিনূন, ৩৩–৩৪ ও ৪৭; আল ফুরকান, ৭–২০; আশ্‌শু'আরা, ১৫৪–১৮৪; ইয়াসীন, ১৫ ও হা–মীম আস্‌ সাজ্‌দাহ, ৬ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও।)

২৭. এটাও সত্য বিরোধীদের একটি পুরাতন অস্ত্র। যে কেউ সংস্কারমূলক কাজের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে সংগে সংগেই তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়। বলা হয়, এর উদ্দেশ্য শুধু ক্ষমতা দখল করা। এ অভিযোগটিই ফেরাউন হযরত মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে এনেছিল। সে বলেছিল, তোমরা দেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার জন্য এসেছো ঃ تكون لكما الكبرياء فى الارض (يونس : ٧٨) এ অভিযোগ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। বলা হয়েছিল ঃ এ ব্যক্তি ইহুদিদের বাদশাহ হতে চায়। আর কুরাইশ সরদাররাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও এ একই সন্দেহ পোষণ করতো। এ জন্য কয়েকবারই তারা তাঁর সাথে এভাবে সওদাবাজী করতে চেয়েছে যে, যদি তুমি কর্তৃত্ব লাভ করতে চাও, তাহলে "বিরোধী" দল ছেড়ে দিয়ে "সরকারী" দলে এসে যাও। তোমাকে আমরা বাদশাহ বানিয়ে নেবো। আসলে যারা সারা জীবন দুনিয়া ও তার বৈষয়িক স্বার্থ এবং তার গৌরব ও বাহ্যিক চাকচিক্য লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তাদের পক্ষে একথা কল্পনা করা কঠিন বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যে, এ দুনিয়ায় এমন কোন মানুষ থাকতে পারে যে সদুদ্দেশ্যে ও নিস্বার্থপরতার সাথে মানবতার কল্যাণার্থেও নিজের প্রাণপাত করতে পারে। তারা নিজেরাই যেহেতু নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য প্রতিদিন হৃদয়গ্রাহী শ্লোগান ও সংস্কারের মিথ্যা দাবী পেশ করতে থাকে তাই এ প্রতারণা ও জালিয়াতী তাদের দৃষ্টিতে হয় একেবারেই একটি স্বাভাবিক জিনিস। তারা মনে করে সংস্কার কথাটা প্রতারণা ও

জালিয়াতি ছাড়া কিছু নয়। সততা ও আন্তরিকতার সাথে কখনো সংস্কারমূলক কোন কাজ করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই এ নামটি উচ্চারণ করে সে নিশ্চয়ই তাদেরই মত ধোঁকাবাজ। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, সংস্কারকদের বিরুদ্ধে."ক্ষমতা লোভের" এ অপবাদ চিরকাল ক্ষমতাসীন লোকেরা ও তাদের তোষামোদী গোষ্ঠীই লাগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তারা যেন একথা বলতে চায় যে, তারা নিজেরা ও তাদের মহান প্রভুরা যে ক্ষমতা লাভ করেছে তা যেন তাদের জন্মগত অধিকার। তা অর্জন করার ও তা দখল করে রাখার জন্য তারা কোনক্রমে অভিযুক্ত হতে পারে না। তবে এ "খাদ্যে" যাদের জন্মগত অধিকার ছিল না এবং এখন যারা নিজেদের মধ্যে এর "ক্ষুধা" অনুভব করছে তারা চরমভাবে নিন্দাবাদ লাভের যোগ্য। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য ৩৬ টীকা দেখুন)।

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার দোষ ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য যে ব্যক্তিই অগ্রসর হবে এবং এর মোকাবিলায় সংস্কারমূলক মতাদর্শ ও ব্যবস্থা পেশ করবে তার জন্য অবশ্যই সংস্কারের পথে যেসব শক্তিই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তাদেরকে সরিয়ে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং যেসব শক্তি সংস্কারমূলক মতাদর্শ ও ব্যবস্থাকে কার্যত প্রবর্তিত করতে পারবে তাদেরকে ক্ষমতাসীন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তাছাড়া এ ধরনের লোকের দাওয়াত যখনই সফল হবে, তার স্বাভাবিক পরিণতিতে সে জনগণের ইমাম ও নেতায় পরিণত হবে এবং নতুন ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি হয় তার নিজের হাতে থাকবে নয়তো তার সমর্থক ও অনুসারীরা জনগণের ওপর কর্তৃত্বশীল হবে। দুনিয়ায় এমন কোন্ নবী ও সংস্কারক ছিলেন যিনি নিজের দাওয়াতকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করা যার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল না? আর এমন কে আছেন যার দাওয়াতের সাফল্য তাঁকে যথার্থই নেতায় পরিণত করেনি? তারপর এ বিষয়টি কি সত্যিই কারোর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য যথেষ্ট যে, সে আসলে ক্ষমতালোভী ছিল এবং তার আসল উদ্দেশ্য ছিল নেতৃত্ব লাভ এবং তা সে অর্জন করেছিল? অসৎ প্রকৃতির সত্যের দুশমনরা ছাড়া কেউ এ প্রশ্নের জবাবে হাঁ বলবে না। আসলে ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতা কাংখিত হওয়া এবং কোন সৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা কাংখিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে যমীন্ আসমান ফারাক। এটা এত বড় ফারাক যেমন ফারাক আছে ডাক্তারের ছুরি ও ডাকাতের ছুরির মধ্যে। ডাক্তার ও ডাকাত উভয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের পেটে ছুরি চালায় এবং এর ফলে অর্থ লাভ করে যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র এ কারণে উভয়কে একাকার করে ফেলে তাহলে এটা হবে নিছক তার নিজেরই চিন্তা বা মনের ভুল। নয়তো উভয়ের নিয়ত, কর্মপদ্ধতি ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য থাকে যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ডাকাতকে ডাক্তার এবং ডাক্তারকে ডাকাত মনে করার মতো ভুল করতে পারে না।

২৭(ক). নূহের সম্প্রদায় আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না এবং তারা একথাও অস্বীকার করতো না যে, তিনিই বিশ্ব–জাহানের প্রভু এবং সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নির্দেশের অনুগত, এ বক্তব্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শির্ক বা আল্লাহকে অস্বীকার করা এ জাতির আসল ভ্রষ্টতা ছিল না বরং তারা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা এবং তাঁর অধিকারে অন্যকে শরীক করতো।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

*নূহ বললো, "হে পরওয়ারদিগার! এরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে এ জন্য তুমিই আমাকে সাহায্য করো।"[২৮] আমি তার কাছে অহী করলাম, "আমার তত্বাবধানে এবং আমার অহী মোতাবেক নৌকা তৈরী করো। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলা উথলে উঠবে[২৯] তখন তুমি সব ধরনের প্রাণীদের এক একটি জোড়া নিয়ে এতে আরোহণ করো এবং পরিবার পরিজনদেরকেও সংগে নাও, তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে এবং জালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলো না, তারা এখন ডুবতে যাচ্ছে।*

২৮. অর্থাৎ আমার প্রতি এভাবে মিথ্যা আরোপ করার প্রতিশোধ নাও। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (القمر : ١٠)

"কাজেই নূহ নিজের রবকে ডেকে বললো ঃ আমাকে দমিত করা হয়েছে, এখন তুমিই এর বদ্‌লা নাও।" (আল কামার, ১০)

সূরা নূহে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ○ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

"আর নূহ বললো ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! এ পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে একজন অধিবাসীকেও ছেড়ে দিও না। যদি তুমি তাদেরকে থাকতে দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করে দেবে এবং তাদের বংশ থেকে কেবল দুস্কৃতকারী ও সত্য অস্বীকারকারীরই জন্ম হবে।" (২৭ আয়াত)

২৯. কেউ কেউ تنور (তান্নূর) বলতে ভূমি বুঝেছেন। কেউ এর অর্থ করেছেন ভূমির উচ্চতম অংশ। কেউ বলেছেন, فَارَ التَّنُّور মানে হচ্ছে প্রভাতের উদয়। আবার কারোর মতে এটি حمى الوطيس এর মতো একটি উপমা, যার মানে হয় "পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া।" কিন্তু বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করার পথে যখন কোন বাধা নেই তখন কুরআনের

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

*তারপর যখন তুমি নিজের সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহণ করবে তখন বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালেমদের হাত থেকে।*[৩০] *আর বলো, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে নামিয়ে দাও বরকতপূর্ণ স্থানে এবং তুমি সর্বোত্তম স্থান দানকারী।"*[৩১]

*এ কাহিনীতে বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে,*[৩২] *আর পরীক্ষা তো আমি করেই থাকি।*[৩৩]

*তাদের পরে আমি অন্য এক যুগের জাতির উত্থান ঘটালাম।*[৩৪] *তারপর তাদের মধ্যে স্বয়ং তাদের সম্প্রদায়ের একজন রসূল পাঠালাম (যে তাদেরকে দাওয়াত দিল এ মর্মে যে,) আল্লাহর বন্দেগী করো, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না?*

শব্দাবলীর কোন প্রকার সম্বন্ধ–সামঞ্জস্য ছাড়াই পরোক্ষ অর্থে গ্রহণ করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। এ শব্দাবলী পড়ার পর প্রথমে মনের মধ্যে যে অর্থটির উদয় হয় তা হচ্ছে এই যে, কোন বিশেষ চুলা পূর্ব থেকেই এভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, তার নিম্নদেশ ফেটে পানি উথলে ওঠার মাধ্যমে প্লাবনের সূচনা হবে। অন্য কোন অর্থের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন তখনই আসে যখন এত বড় প্লাবন একটি চুলার নিচে থেকে পানি উথলে ওঠার মাধ্যমে শুরু হয়ে থাকবে বলে মানুষ মেনে নিতে রাজি না হয়। কিন্তু আল্লাহর কর্মকাণ্ড বড়ই অদ্ভুত। তিনি যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন তখন এমন পথে করেন যার কোন কল্পনাই সে করতে পারে না।

৩০. কোন জাতির ধ্বংসের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার হুকুম দেয়া তার চরম অসদাচার, লাম্পট্য ও দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ।

৩১. নামিয়ে দেয়া মানে নিছক নামিয়ে দেয়া নয় বরং আরবী প্রবাদ অনুযায়ী এর মধ্যে "আপ্যায়নের" অর্থও রয়েছে। অন্য কথায় এ দোয়ার অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! এখন আমরা তোমার মেহমান এবং তুমিই আমাদের আপ্যায়নকারী মেজবান।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

৩ রুকূ'

*তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং আখেরাতের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলেছিল, যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে প্রাচুর্য দান করেছিলাম,[৩৫] তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা কিছু খাও তা–ই সে খায় এবং তোমরা যা কিছু পান করো তা–ই সে পান করে। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৬] সে কি তোমাদেরকে একথা জানায় যে, যখন তোমরা সবার পরে মাটিতে মিশে যাবে এবং হাড়গোড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে? অসম্ভব, তোমাদের সাথে এই যে অংগীকার করা হচ্ছে এটা একেবারেই অসম্ভব। জীবন কিছুই নয়, ব্যস এ পার্থিব জীবনটি ছাড়া; এখানেই আমরা মরি–বাঁচি এবং আমাদের কখ্খনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না।*

৩২. অর্থাৎ এর মধ্যে রয়েছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা। এ শিক্ষা হচ্ছে : তাওহীদের দাওয়াত দানকারী নবীগণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শিরকপন্থী কাফেররা ছিল মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর আজ মক্কায় সে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা এক সময় ছিল হযরত নূহ ও তার জাতির মধ্যে। এর পরিণামও তার চেয়ে কিছু ভিন্ন হবার নয়। আল্লাহর ফায়সালায় যতই বিলম্ব হোক না কেন একদিন অবশ্যই তা হয়েই যায় এবং অনিবার্যভাবে তা হয় সত্যপন্থীদের পক্ষে এবং মিথ্যাপন্থীদের বিপক্ষে।

৩৩. এর অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, "পরীক্ষা তো আমি করতেই চেয়েছিলাম" অথবা "পরীক্ষা তো আমাকে করতেই হবে"। তিনটি অবস্থায়ই এ সত্যটি অবগত করানোই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ কোন জাতিকেই নিজের রাজ্যে নিজের অসংখ্য

জিনিসের ওপর কর্তৃত্ব দান করে এমনিই তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তাকে পরীক্ষা করেন এবং নিজের কর্তৃত্ব ক্ষমতাকে সে কিভাবে ব্যবহার করছে তা দেখতে থাকেন। নূহের জাতির সাথে যা কিছু ঘটেছে এ নিয়ম অনুযায়ীই ঘটেছে এবং অন্য কোন জাতিই আল্লাহর এত প্রিয় নয় যে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাণ্ডার থেকে নিজের ইচ্ছে মতো নেবার জন্য তাকে অবাধ স্বাধীনতা দিবেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই সবার সাথে একই ব্যবহার করা হয়।

৩৪. কেউ কেউ এখানে সামূদ জাতির কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেছেন। কারণ সামনের দিকে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ এ জাতিকে "সাইহাহ" তথা প্রচণ্ড আওয়াজের আযাবে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে, সামূদ এমন একটি জাতি যার ওপর এ আযাব এসেছিল। (হূদ, ৬৭; আল হিজ্‌র, ৮৩ ও আল কামার, ৩১) অন্য কিছু মুফাস্‌সির বলেছেন, এখানে আসলে আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে নূহের জাতির পরে এ জাতিটিকেই বৃহৎ শক্তিধর করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ (اعراف : ٦٩)

এ দ্বিতীয় কথাটিই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ "নূহের জাতির পরে" শব্দাবলী এ দিকেই ইংগিত করে। আর "সাইহাহ্" (প্রচণ্ড আওয়াজ, চিৎকার, শোরগোল, মহাগোলযোগ) এর সাথে যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে নিছক এতটুকু সম্বন্ধই এ জাতিকে সামূদ গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এ শব্দটি সাধারণ ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্য দায়ী বিকট ধ্বনির জন্য যেমন ব্যবহার হয় তেমনি ধ্বংসের কারণ যাই হোক না কেন ধ্বংসের সময় যে শোরগোল ও মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার জন্যও ব্যবহার হয়।

৩৫. এখানে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো ভেবে দেখার মতো। নবীর বিরোধিতায় যারা এগিয়ে এসেছিল। তারা ছিল জাতির নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের সবার মধ্যে যে ভ্রষ্টতা একযোগে কাজ করছিল তা ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করতো। তাই তাদের মনে আল্লাহর সামনে কোন জবাবদিহি করার আশংকা ছিল না। আর এ জন্যই দুনিয়ার এ জীবনটাই ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং "বৈষয়িক কল্যাণ ও সাফল্যের" উর্ধে অন্য কোন মূল্যবোধের স্বীকৃতি তাদের কাছে ছিল না। আবার যে জিনিসটি তাদেরকে এ ভ্রষ্টতার মধ্যে একেবারেই নিমজ্জিত করে দিয়েছিল তা ছিল এমন পর্যায়ের প্রাচুর্য ও সুখ–সম্ভোগ যাকে তারা নিজেদের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রমাণ মনে করতো। এ সংগে তারা একথাও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, যে আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিক ব্যবস্থা ও জীবনধারার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে তারা দুনিয়ায় এসব সাফল্য অর্জন করেছে তা ভুলও হতে পারে। মানুষের ইতিহাস বারবার এ সত্যটির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে যে, সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতাকারীদের দলে সবসময় এ তিন ধরনের বৈশিষ্টের অধিকারী লোকরাই আসে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় তাঁর সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এটিই ছিল সেখানকার পরিস্থিতি।

৩৬. কেউ কেউ ভুল বুঝেছেন যে, তারা নিজেদের মধ্যে এসব কথা বলাবলি করতো। না, বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করে তারা একথা বলতো। জাতির সরদাররা যখন

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

*এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিছক মিথ্যা তৈরী করছে[৩৬(ক)] এবং আমরা কখনো তার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" রসূল বললো, "হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো এ ব্যাপারে এখন তুমিই আমাকে সাহায্য করো।" জবাবে বলা হলো, "অচিরেই তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে।" শেষ পর্যন্ত যথাযথ সত্য অনুযায়ী একটি মহা গোলযোগ তাদেরকে ধরে ফেললো এবং আমি তাদেরকে কাদা[৩৭] বানিয়ে নিক্ষেপ করলাম—দূর হয়ে যাও জালেম জাতি!*

*তারপর আমি তাদের পরে অন্য জাতিদের উঠিয়েছি। কোন জাতি তার সময়ের পূর্বে শেষ হয়নি এবং তার পরে টিকে থাকতে পারেনি। তারপর আমি একের পর এক নিজের রসূল পাঠিয়েছি। যে জাতির কাছেই তার রসূল এসেছে সে–ই তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, আর আমি একের পর এক জাতিকে ধ্বংস করে গেছি এমনকি তাদেরকে স্রেফ কাহিনীই বানিয়ে ছেড়েছি, —অভিসম্পাত তাদের প্রতি যারা ঈমান আনে না।[৩৮]*

আশংকা করলো, জনগণ নবীর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব এবং হৃদয়গ্রাহী কথায় প্রভাবিত হয়ে যাবে এবং তাদের প্রভাবিত হয়ে যাবার পর আমাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আর কাদের ওপর চলবে তখন তারা নিজেদের বক্তৃতার মাধ্যমে এসব কথা জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকলো। ওপরে নূহের জাতির আলোচনায় যে কথা বলা হয়েছিল এটি তারই দ্বিতীয় একটি দিক। তারা বলতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব নবুয়ত টবুয়ত কিছুই দেয়া হয়নি এটা হচ্ছে আসলে ক্ষমতা লিপ্সা, এরি মোহে অন্ধ হয়ে এ ব্যক্তি এসব আবোল তাবোল বলছে। তারা বলে ঃ ভাইসব! একটু ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি কোন্ ব্যাপারে

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

*তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারুনকে নিজের নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণ[৩৯] সহকারে ফেরাউন ও তার রাজ পারিষদদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো এবং তারা ছিল বড়ই আস্ফালনকারী।[৪০] তারা বলতে লাগলো, "আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো?[৪০(ক)] আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস।[৪১] কাজেই তারা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হলো।[৪২] আর মূসাকে আমি কিতাব দান করেছি যাতে লোকেরা তার সাহায্যে পথের দিশা পায়।*

*আর মারয়াম পুত্র ও তার মাকে আমি একটি নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম[৪৩] এবং তাদেরকে রেখেছিলাম একটি সুউচ্চ ভূমিতে, সে স্থানটি ছিল নিরাপদ এবং সেখানে স্রোতস্বিনী প্রবহমান ছিল।[৪৪]*

তোমাদের থেকে আলাদা? তোমাদের শরীর যেমন রক্ত–মাংসের তারও তাই। তোমাদের ও তার মধ্যে কোন ফারাক নেই। তাহলে কেন সে বড় হবে এবং তোমরা তার ফরমানের আনুগত্য করবে? তাদের এসব ভাষণের মধ্যে যেন একথা নির্বিবাদে স্বীকৃত ছিল যে, তারা যে তাদের নেতা এ নেতৃত্ব তো তাদের লাভ করারই কথা, তাদের শরীরের রক্ত মাংস ও তাদের পানাহারের ধরন ধারণের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রশ্নই দেখা দেয় না, তাদের নেতৃত্ব আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ এটা তো আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। আসলে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এ নতুন নেতৃত্ব, যা এখন প্রতিষ্ঠা লাভের পথে। এভাবে তাদের কথাগুলো নূহের জাতির নেতাদের কথা থেকে কিছু বেশী ভিন্নতর ছিল না। তাদের মতে কোন নতুন আগমনকারীর মধ্যে যে "ক্ষমতা লিপ্সা" অনুভূত হয় অথবা তার মধ্যে এ লিপ্সা থাকার যে সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে সেটিই হচ্ছে নিন্দনীয় ও অপবাদযোগ্য। আর নিজেদের ব্যাপারে তারা মনে করতো যে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের

প্রকৃতিগত অধিকার, এ অধিকারের ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে গেলেও তা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় ও আপত্তিকর হবার কথা নয়।

৩৬(ক). এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর অস্তিত্বকে তারাও অস্বীকার করতো না। তাদেরও আসল ভ্রষ্টতা ছিল শিরক। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ জাতির এ অপরাধই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দেখুন আল আ'রাফ, ৭: হূদ, ৫৩-৫৪; হা-মীম আস্‌সাজদাহ, ১৪ এবং আল আহকাফ, ২১-২২ আয়াত।

৩৭. মূলে غُثَاءً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় বন্যার তোড়ে ভেসে আসা ময়লা আবর্জনা, যা পরবর্তী পর্যায়ে কিনারায় আটকে পড়ে পচে যেতে থাকে।

৩৮. অন্য কথায় যারা নবীদের কথা মানে না।

৩৯. নিদর্শনের পরে "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলার অর্থ এও হতে পারে যে, ঐ নিদর্শনাবলী তাঁদের সাথে থাকাটাই একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। অথবা নিদর্শনাবলী বলতে বুঝানো হয়েছে "লাঠি" ছাড়া মিসরে অন্যান্য যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছে সেগুলো সবই, আর "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলতে "লাঠি" বুঝানো হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে যে মু'জিযার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলোর পরে তো একথা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এরা দু'ভাই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছেন, (বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয যুখরুফ, ৪৩-৪৪ টীকা দেখুন)।

৪০. মূলে وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তারা ছিল বড়ই আত্মম্ভরী, জালেম ও কঠোর। দুই, তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতো এবং উদ্ধত আষ্ফালন করতো।

৪০(ক). ব্যাখ্যার জন্য ২৬ টীকা দেখুন।

৪১. আরবী ভাষায় কারো "ফরমানের অনুগত" হওয়া এবং "তার ইবাদাতগুজার" হওয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়। যে ব্যক্তি কারোর বন্দেগী-দাসত্ব ও আনুগত্য করে সে যেন তার ইবাদাত করে। এ থেকে "ইবাদাত" শব্দটির অর্থের ওপর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর ছাড়া বাকি সবার ইবাদাত পরিত্যাগ করার যে আদেশ নবীগণ তাদের দাওয়াতের মধ্যে দিতেন তার পূর্ণ অর্থ কি ছিল তার ওপর বড়ই গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত হয়। তাঁদের কাছে "ইবাদাত" নিছক "পূজা অনুষ্ঠান" ছিল না। তাঁরা এ দাওয়াত দেননি যে, আল্লাহকে কেবল পূজা করো এবং এরপর যাকে ইচ্ছা তার বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে থাকো। বরং তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পূজারী করতে চাইতেন এবং একই সংগে তাঁর ফরমানের অনুগতও। আর এ উভয় অর্থের দৃষ্টিতে অন্য কারো ইবাদাত করাকে পথভ্রষ্টতা গণ্য করতেন। (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, আল কাহফ, ৫০ টীকা দেখুন)।

৪২. মূসা ও ফেরাউনের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য পড়ুন সূরা আল বাকারাহ, ৪৯-৫০; আল আ'রাফ, ১০৩ থেকে ১৩৬; ইউনুস, ৭৫ থেকে ৯২; হূদ, ৯৬ থেকে ৯৯; বনী ইসরাঈল, ১০১ থেকে ১০৪ এবং ত্বা-হা, ৯ থেকে ৮০ আয়াত।

৪৩. একথা বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র একটি নিদর্শন ছিল এবং স্বয়ং মারয়াম একটি নিদর্শন ছিল। আবার একথাও বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র ও তার মাকে দু'টি

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

৪ রুকূ'

*হে রসূল।[৪৫] পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো।[৪৬] তোমরা যা কিছুই করো না কেন আমি তা ভালোভাবেই জানি। আর তোমাদের এ উম্মত হচ্ছে একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো।[৪৭]*

*কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দীনকে পরস্পরের মধ্যে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তার মধ্যেই তারা নিমগ্ন হয়ে গেছে।[৪৮]*

নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম। বরং বলা হয়েছে, তাদের দু'জনকে মিলিয়ে একটি নিদর্শনে পরিণত করা হয়েছিল। এর অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, পিতা ছাড়া ইবনে মারয়ামের জন্ম হওয়া এবং স্বামীর সাহচর্য ছাড়া মারয়ামের গর্ভধারণ করাই এমন একটি জিনিস যা তাদের দু'জনকে একটি নিদর্শনে পরিণত করে দেয়। যারা পিতা ছাড়া হযরত ঈসার জন্ম অস্বীকার করে তারা মাতা ও পুত্রের একটি নিদর্শন হবার কি ব্যাখ্যা দেবেন? (আরো বিস্তারিত জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৪৪-৫৩; আন নিসা, ১৯০, ২১২, ২১৩; মারয়াম, ১৫ থেকে ২২ এবং আল আম্বিয়া, ৮৯-৯০ টীকা দেখুন) এখানে দু'টি কথা আরো ব্যাখ্যা যোগ্য। এক, হযরত ঈসা ও তাঁর মাতার ব্যাপারটি মূর্খ লোকদের আর একটি দুর্বলতা চিহ্নিত করছে। ওপরে যে সকল নবীর কথা আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তো এ বলে অস্বীকার করা হয়েছে যে, তোমরা তো মানুষ আর মানুষ কি কখনো নবী হতে পারে? কিন্তু লোকেরা যখন হযরত ঈসার ও তাঁর মায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাদের ভক্ত হয়ে গেলো তখন তাদেরকে মানুষের মর্যাদা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিল। দুই, যারা হযরত ঈসার অলৌকিক জন্ম এবং দোলনায় শায়িত অবস্থায় তাঁর ভাষণ শুনে তাঁর মুজিযা হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখে নেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং হযরত মারয়ামকে অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হয়েছিল যা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য চিরকালীন শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

৪৪. বিভিন্ন জন এ থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশ্‌ক। কেউ বলেন, আর্‌রমলাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাক্‌দিস আবার কেউ বলেন মিসর। খৃষ্টীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মারয়াম হযরত ঈসার জন্মের পর তাঁর

হেফাজতের জন্য দু'বার স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথমবার বাদশাহ হিরোডিয়াসের আমলে তিনি তাকে মিসরে নিয়ে যান এবং বাদশাহর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আর্‌খিলাউসের শাসনামলে তাঁকে গালীলের নাসেরাহ শহরে আশ্রয় নিতে হয়। (মথি ২ ঃ ১৩ থেকে ২৩) এখন কুরআন কোন্ স্থানটির প্রতি ইংগিত করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। আভিধানিক অর্থে "রাবওয়াহ" এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উঁচু। অন্যদিকে "যা-তি কারার" (ذات قرار) মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর "মাঈন"(معين) মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নির্ঝরিণী।

৪৫. আগের ২টি রুকূ'তে বিভিন্ন নবীর কথা বলার পর এখন يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ বলে সকল নবীকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, সকল নবী এক সংগে এক জায়গায় ছিলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। বরং এ থেকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, প্রতি যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে আগমনকারী নবীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে একই হুকুম দেয়া হয়েছিল। পরের আয়াতে যেহেতু সকল নবীকে এক উম্মত, এক জামায়াত ও এক দলভুক্ত গণ্য করা হয়েছে তাই এখানে এমন বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যার ফলে চোখের সামনে তাদের সবার এক দলভুক্ত হবার ছবি ভেসে ওঠে। তারা যেন সবাই এক জায়গায় সমবেত আছেন এবং সবাইকে একই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ যুগের একদল স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এ বর্ণনা রীতির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারেননি এবং তারা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এ সম্বোধনটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আগমনকারী নবীদেরকে করা হয়েছে এবং এ থেকে তাঁর পরে নবুওয়াতের ধারা পরম্পরা জারি হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাবতে অবাক লাগে যে, যারা ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসবোধ থেকে এত বেশী বঞ্চিত তারা আবার কুরআনের ব্যাখ্যা করার দুঃসাহস করেন।

৪৬. পাক-পবিত্র জিনিস বলে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা নিজেও পাক-পবিত্র এবং হালাল পথে অর্জিতও হয়। পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। মুসলমান বৈরাগী ও যোগীর মতো পবিত্র জীবিকা থেকে যেমন নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি দুনিয়া পূজারী ও ভোগবাদীর মতো হালাল-হারামের পার্থক্য না করে সব জিনিসে মুখও লাগাতে পারে না।

সৎকাজ করার আগে পবিত্র ও হালাল জিনিস খাওয়ার নির্দেশের মধ্যে এদিকে পরিষ্কার ইংগিত রয়েছে যে, হারাম খেয়ে সৎকাজ করার কোন মানে হয় না। সৎকাজের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে হালাল রিযিক খাওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।" তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন এবং তারপর বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

*—বেশ, তাহলে ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক নিজেদের গাফিলতির মধ্যে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত।[৪৯]*

*তারা কি মনে করে, আমি যে তাদেরকে অর্থ ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি, তা দ্বারা আমি তাদেরকে কল্যাণ দানে তৎপর রয়েছি? না, আসল ব্যাপার সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নেই।[৫০]*

اَلرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَغْبَرَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَارَبِّ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ

"এক ব্যক্তি আসে সুদীর্ঘ পথ সফর করে। দেহ ধূলি ধূসরিত। মাথার চুল এলোমেলো। আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করে : হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, কাপড় চোপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যে তার দেহ প্রতিপালিত হয়েছে। এখন কিভাবে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে।" [মুসলিম, তিরমিযী ও আহমাদ, আবু হুরাইরা (রা) থেকে]

৪৭. "তোমাদের উম্মত একই উম্মত"—অর্থাৎ তোমরা একই দলের লোক। "উম্মত" শব্দটি এমন ব্যক্তি সমষ্টির জন্য বলা হয় যারা কোন সম্মিলিত মৌলিক বিষয়ের জন্য একতাবদ্ধ হয়। নবীগণ যেহেতু স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই বিশ্বাস, একই জীবন বিধান ও একই দাওয়াতের ওপর একতাবদ্ধ ছিলেন, তাই বলা হয়েছে, তাঁদের সবাই একই উম্মত। পরবর্তী বাক্য নিজেই সে মৌলিক বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছে যার ওপর সকল নবী একতাবদ্ধ ও একমত ছিলেন। (অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ১৩০ থেকে ১৩৩; আলে ইমরান, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪, ৬৪ ও ৭৯ থেকে ৮৫; আন নিসা, ১৫০ থেকে ১৫২; আল আ'রাফ, ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; ইউসুফ, ৩৭ থেকে ৪০; মারয়াম, ৪৯ থেকে ৫৯ এবং আল আম্বিয়া, ৭১ থেকে ৯৩ আয়াত।)

৪৮. এটা নিছক ঘটনার বর্ণনা নয় বরং সূরার শুরু থেকে যে যুক্তিধারা চলে আসছে তার একটি পর্যায়। যুক্তির সারসংক্ষেপ হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী যখন এ তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন তখন অনিবার্যভাবে এ থেকে প্রমাণ হয়, এ ইসলামই মানব জাতির আসল দীন বা ধর্ম। অন্যান্য যেসব ধর্মের অস্তিত্ব আজ দুনিয়ার বুকে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো এ দীনেরই বিকৃত রূপ। এর কোন কোন নির্ভুল অংশের চেহারা বিকৃত করে এবং তার মধ্যে অনেক মনগড়া কথা বাড়িয়ে দিয়ে সেগুলো তৈরী করা হয়েছে। এখন যারা এসব ধর্মের ভক্ত-অনুরক্ত তারাই ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে। অন্যদিকে যারা এগুলো ত্যাগ করে আসল দীনের দিকে আহবান জানাচ্ছে তারা মোটেই বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে না।

৪৯. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যের মাঝখানে একটি ফাঁক আছে। এ ফাঁকটি ভরে দেয়ার পরিবর্তে শ্রোতার চিন্তা–কল্পনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কারণ ভাষণের পটভূমি নিজেই তাকে ভরে ফেলছে। এ পটভূমি হচ্ছে, আল্লাহর এক বান্দা পাঁচ ছয় বছর থেকে মানুষকে আসল দীনের দিকে ডাকছেন। যুক্তির সাহায্যে তাদেরকে নিজের কথা বুঝিয়ে বলছেন। ইতিহাসের নজীর পেশ করছেন। তার দাওয়াতের প্রভাব ও ফলাফল কার্যত চোখের সামনে আসছে। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রও সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু এ সত্ত্বেও লোকেরা শুধু যে বাপ–দাদাদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাতিলের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে তা নয় এবং শুধু যে সুস্পষ্ট যুক্তি–প্রমাণ সহকারে যে সত্য পেশ করা হচ্ছে তাকে মেনে নিতেও তারা প্রস্তুত হয়নি তা নয়। বরং তারা আদাপানি খেয়ে সত্যের আহবায়কের পিছনেও লেগে যায় এবং তাঁর দাওয়াতকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য হঠকারিতা, অপবাদ রটনা, জুলুম, নিপীড়ন, মিথ্যাচার তথা যাবতীয় নিকৃষ্ট ধরনের কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকছে না। এহেন পরিস্থিতিতে আসল সত্য দীনের একক অস্তিত্ব এবং পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ধর্মসমূহের স্বরূপ বর্ণনা করার পর "ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক তারা নিজেদের গাফিলতির মধ্যে" একথা বলা স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থ প্রকাশ করে যে, "ঠিক আছে, যদি এরা না মেনে নেয় এবং নিজেদের ভ্রষ্টতার মধ্যে আকন্ঠ ডুবে থাকতে চায় তাহলে এদেরকে সেভাবেই থাকতে দাও।" এই "ছেড়ে দাও"–কে একেবারেই শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করে "এখন আর প্রচারই করো না" বলে মনে করা বাকভংগী সম্পর্কে অজ্ঞতাই প্রমাণ করবে। এ ধরনের অবস্থায় একথা প্রচার ও উপদেশ দানে বিরত থাকার জন্য নয় বরং গাফিলদেরকে ঝাঁকুনি দেবার জন্য বলা হয়ে থাকে। তারপর "একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত" শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি গভীর সতর্ক সংকেত। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকার ব্যাপারটা দীর্ঘক্ষণ চলতে পারবে না। এমন একটি সময় আসবে যখন তারা সজাগ হয়ে যাবে এবং আহবানকারী যে জিনিসের দিকে আহবান করছিল তার স্বরূপ তারা উপলব্ধি করতে পারবে এবং তারা নিজেরা যে জিনিসের মধ্যে ডুবে ছিল তার সঠিক চেহারাও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

৫০. এখানে এসে সূরার সূচনা পর্বের আয়াতগুলোর ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন। সে একই বিষয়বস্তুকে আবার অন্যভাবে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তারা "কল্যাণ", "ভালো" ও "সমৃদ্ধি"র একটি সীমিত বস্তুবাদী ধারণা রাখতো। তাদের মতে, যে ব্যক্তি ভালো খাবার, ভালো পোশাক ও ভালো ঘর–বাড়ি লাভ করেছে, যাকে অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি দান করা হয়েছে এবং সমাজে যে খ্যাতি ও প্রভাব–প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ মৌলিক বিভ্রান্তির ফলে তারা আবার এর চেয়ে অনেক বড় আর একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সেটি ছিল এই যে, এ অর্থে যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে সে নিশ্চয়ই সঠিক পথে রয়েছে বরং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নয়তো এসব সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে এ সাফল্য থেকে যাদেরকে আমরা প্রকাশ্যে বঞ্চিত দেখছি তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ভুল পথে রয়েছে এবং তারা খোদা বা খোদাদের গযবের শিকার হয়েছে। এ বিভ্রান্তিটি আসলে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর অধিকারী লোকদের ভ্রষ্টতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম। একে কুরআনের

বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে খণ্ডন করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে প্রকৃত সত্য কি তা বলে দেয়া হয়েছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ১২৬ ও ২১২; আল আ'রাফ, ৩২; আত্ তাওবাহ, ৫৫, ৬৯ ও ৮৫; ইউনুস, ১৭; হূদ, ৩, ২৭ থেকে ৩১, ৩৮ ও ৩৯; আর রা'আদ, ২৬; আল কাহ্‌ফ, ২৮, ৩২ থেকে ৪৩ ও ১০৩ থেকে ১০৫; মার্‌য়াম, ৭৭ থেকে ৮০; ত্বা-হা, ১৩১ ও ১৩২ ও আল আম্বিয়া, ৪৪ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও)।

এ ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য রয়েছে যেগুলো ভালোভাবে অনুধাবন না করলে চিন্তা ও মন-মানস কখনোই পরিচ্ছন্ন হতে পারে না।

এক ঃ "মানুষের সাফল্য"কে কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির নিছক বস্তুবাদী সমৃদ্ধি ও সাময়িক সাফল্য অর্থে গ্রহণ করার চাইতে তা অনেক বেশী ব্যাপক ও উন্নত পর্যায়ের জিনিস।

দুই ঃ সাফল্যকে এ সীমিত অর্থে গ্রহণ করার পর যদি তাকেই সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মানদণ্ড গণ্য করা হয় তাহলে তা এমন একটি মৌলিক ভ্রষ্টতায় পরিণত হয় যার মধ্য থেকে বাইরে বের না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ কখনো বিশ্বাস, চিন্তা, নৈতিকতা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে সঠিক পথ লাভ করতেই পারে না।

তিন ঃ দুনিয়াটা আসলে প্রতিদান দেবার জায়গা নয় বরং পরীক্ষাগৃহ। এখানে নৈতিক শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলেও তা বড়ই সীমিত পর্যায়ের ও অসম্পূর্ণ ধরনের এবং তার মধ্যেও পরীক্ষার দিকটি রয়েছে। এ সত্যটি এড়িয়ে গিয়ে একথা মনে করা যে, এখানে যে ব্যক্তি যে নিয়ামতই লাভ করছে তা লাভ করছে "পুরস্কার" হিসেবেই এবং সেটি লাভ করা পুরস্কার লাভকারীর সত্য, সৎ ও আল্লাহর প্রিয় হবার প্রমাণ আর যার ওপর যে বিপদও আসছে তা হচ্ছে তার "শাস্তি" এবং তা একথাই প্রমাণ করছে যে, শাস্তিলাভকারী মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে অসৎ ও আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। আসলে এসব কিছু একটি বিভ্রান্তি বরং নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবত আমাদের সত্য সম্পর্কিত ধারণা ও নৈতিকতার মানদণ্ডকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই। একজন সত্যসন্ধানীকে প্রথম পদক্ষেপেই একথা অনুধাবন করতে হবে যে, এ দুনিয়াটি মূলত একটি পরীক্ষাগৃহ এবং এখানে অসংখ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যক্তিদের, জাতিদের ও সমগ্র বিশ্বমানবতার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এ পরীক্ষার মাঝখানে লোকেরা যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় সেগুলো পুরস্কার ও শাস্তির শেষ পর্যায় নয়। কাজেই সেগুলোকে মতবাদ, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডের সঠিক ও বেঠিক হওয়ার মানদণ্ডে পরিণত করা এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় ও অপ্রিয় হবার আলামত গণ্য করা যাবে না।

চার ঃ সাফল্যের প্রান্ত নিশ্চিতভাবেই সত্য ও সৎকর্মের সাথে বাঁধা আছে এবং মিথ্যা ও অসৎকর্মের পরিণাম ক্ষতি এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুনিয়ায় যেহেতু মিথ্যা ও অসৎকর্মের সাথে সাময়িক ও বাহ্যিক সাফল্য এবং অনুরূপভাবে সত্য ও সৎকর্মের সাথে প্রকাশ্য ও সাময়িক ক্ষতি সম্ভবপর আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ জিনিসটি ধোঁকা বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই সত্য-মিথ্যা ও সৎ-অসৎ যাচাই করার জন্য একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

*আসলে কল্যাণের দিকে দৌড়ে যাওয়া ও অগ্রসর হয়ে তা অর্জনকারী লোক[৫০(ক)] তো তারাই যারা নিজেদের রবের ভয়ে ভীত,[৫১] যারা নিজেদের রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে,[৫২] যারা নিজেদের রবের সাথে কাউকে শরীক করে না[৫৩] এবং যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যা কিছুই দেয় এমন অবস্থায় দেয় যে, তাদের অন্তর এ চিন্তায় কাঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।[৫৪] আমি কোন ব্যক্তির ওপর[৫৪(ক)] তার সাধ্যের বাইরে কোন দায়িত্ব অর্পণ করি না[৫৫] এবং আমার কাছে একটি কিতাব আছে যা (প্রত্যেকের অবস্থা) ঠিকমতো জানিয়ে দেয়[৫৬] আর কোনক্রমেই লোকদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[৫৭]*

মানদণ্ডের প্রয়োজন, যার মধ্যে প্রতারণার ভয় থাকবে না। নবীগণের শিক্ষা ও আসমানী কিতাবসমূহ আমাদের এ মানদণ্ড সরবরাহ করে। মানুষের সাধারণ জ্ঞান (Common-sense)–এর সঠিক হওয়ার সত্যতা বিধান করে এবং "মারূফ" ও "মুন্‌কার" তথা সৎ–কাজ ও অসৎকাজ সম্পর্কিত মানব জাতির সম্মিলিত মানসিক চিন্তা–অনুভূতি এর সত্যতার সাক্ষ দেয়।

পাঁচ ঃ যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি একদিকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ফাসেকী, অশ্লীল কার্যকলাপ, জুলুম ও সীমালংঘন করতে থাকে এবং অন্যদিকে তার ওপর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে তখন বুঝতে হবে, বুদ্ধি ও কুরআন উভয় দৃষ্টিতে আল্লাহ তাকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং তার ওপর আল্লাহর করুণা নয় বরং তাঁর ক্রোধ চেপে বসেছে। ভুলের কারণে যদি তার ওপর আঘাত আসতো তাহলে এর এই অর্থ হতো যে, আল্লাহ এখনো তার প্রতি অনুগ্রহশীল আছেন, তাকে সতর্ক করছেন এবং সংশোধিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন। কিন্তু ভুলের জন্য "পুরস্কার" এ অর্থ প্রকাশ করে যে, তাকে কঠিন শাস্তি দেবার ফায়সালা হয়ে গেছে এবং পেট ভরে পানি নিয়ে ডুবে যাওয়ার জন্য তার নৌকাটি ভাসছে। পক্ষান্তরে যেখানে একদিকে থাকে আল্লাহর প্রতি সত্যিকার আনুগত্য, চারিত্রিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদাচার, দয়া, স্নেহ

ও মমতা এবং অন্যদিকে তার প্রতি বিপদ–আপদ ও কাঠিন্যের অবিরাম ধারা বর্ষিত হতে থাকে এবং আঘাতের পর আঘাতে সে হতে থাকে জর্জরিত সেখানে তা আল্লাহর ক্রোধের নয় বরং হয় তাঁর অনুগ্রহেরই আলামত। স্বর্ণকার স্বর্ণকে খুব বেশী উত্তপ্ত করতে থাকে যাতে তা খুব বেশী ঝকঝকে তকতকে হয়ে যায় এবং দুনিয়াবাসীর সামনে তার পূর্ণ নিখাদ হওয়া প্রমাণ হয়ে যায়। দুনিয়ার বাজারে তার দাম না বাড়লে কিছু আসে যায় না। স্বর্ণকার নিজেই তার দাম দেবে। বরং নিজের অনুগ্রহে বেশী দিয়ে দেবে। তার বিপদ–আপদে যদি ক্রোধের দিক থেকে থাকে তাহলে তা তার নিজের জন্য নয় বরং তার শত্রুদের জন্য অথবা যে সমাজে সৎকর্মশীলরা উৎপীড়িত হয় এবং আল্লাহর নাফরমানরা হয় অনুগৃহীত সে সমাজের জন্য।

৫০(ক). এখানে আমাদের ভাষায় সহজ ভাব প্রকাশের জন্য আমি ৬১ আয়াতের অনুবাদ আগে করেছি এবং ৫৭ থেকে ৬০ পর্যন্ত আয়াতের অনুবাদ করেছি পরে। কেউ যেন ৬১ আয়াতের অনুবাদ ছুটে গিয়েছে বলে মনে না করেন।

৫১. অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি শূন্য ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে না। যা মনে আসে তাই করে না এবং ওপরে একজন আল্লাহ আছেন তিনি জুলুম ও বাড়াবাড়ি করলে পাকড়াও করেন একথা কখনো ভুলে যায় না। বরং তাদের মন সবসময় তাঁর ভয়ে ভীত থাকে এবং তিনিই তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে থাকেন।

৫২. আয়াত বলে দু ধরনের আয়াতই বুঝানো হয়েছে। সেসব আয়াতও যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ পেশ করেন আবার সেগুলোও যেগুলো মানুষের নিজের মনের মধ্যে এবং বিশ্ব চরাচরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিতাবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়ারই নামান্তর এবং বিশ্ব চরাচর ও মানব মনের আয়াতের অর্থাৎ নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনা মূলত সেগুলো যেসব সত্য প্রকাশ করছে তার প্রতি ঈমান আনাই প্রমাণ করে।

৫৩. যদিও আয়াতের প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য ফল এ দাঁড়ায় যে মানুষ তাওহীদ বিশ্বাসী ও আল্লাহর একক সত্তার প্রবক্তা হবে কিন্তু এ সত্ত্বেও শিরক না করার কথা আলাদাভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক সময় মানুষ আয়াত মেনে নিয়েও কোন না কোনভাবে শিরকে লিপ্ত হয়। যেমন রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। এটিও এক ধরনের শিরক। অথবা নবী ও অলীগণের শিক্ষার মধ্যে এমন ধরনের বাড়াবাড়ি করা যা শিরক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা। কিংবা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রবের বন্দেগী ও আনুগত্য এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য প্রভুর আইন মেনে চলা। কাজেই আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনার পর আলাদাভাবে শিরক না করার কথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে একক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নেয় এবং তার গায়ে অন্য কারোর বন্দেগীর সামান্যতম গন্ধও লাগায় না।

৫৪. আরবী ভাষায় "দেয়া" (اِيْتَاء) শব্দটি শুধুমাত্র সম্পদ বা কোন বস্তু দেয়া অর্থেই ব্যবহার হয় না বরং বিমূর্ত জিনিস দেয়া অর্থেও বলা হয়। যেমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য

গ্রহণ করার জন্য বলা হয় اتيته من نفسى القبول আবার কোন ব্যক্তির আনুগত্য অস্বীকার করার জন্য বলা হয় اتيته من نفسى الا بائة কাজেই এ দেয়ার মানে শুধুমাত্র এই নয় যে, তারা আল্লাহর পথে অর্থ–সম্পদ দান করে বরং আল্লাহর দরবারে আনুগত্য ও বন্দেগী পেশ করাও এর অর্থের অন্তরভুক্ত।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতের পুরোপুরি মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তারা যা কিছু সদাচার, সেবামূলক কাজ ও ত্যাগ করে সে জন্য একটুও অহংকার ও তাকওয়ার বড়াই করে না এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাবার অহমিকায় লিপ্ত হয় না। বরং নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সবকিছু করার পরও এ মর্মে আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে থাকে যে, নাজানি এসব তাঁর কাছে গৃহীত হবে কিনা, নিজেদের গোনাহের মোকাবিলায় এগুলো ভারী প্রমাণিত হবে কিনা এবং রবের কাছে মাগফেরাতের জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে কিনা। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম ও জারির বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিই এ অর্থ প্রকাশ করে। এখানে হযরত আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! এর অর্থ কি এই যে, এক ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ও শরাব পান করার সময়ও আল্লাহকে ভয় করবে?" এ প্রশ্ন থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা একে يَاْتُوْنَ مَا اَتَوْا অর্থে গ্রহণ করছিলেন অর্থাৎ "যা কিছু করে করেই যায়। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لاَ يَابِنْتَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّى وَيَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ –

"না, হে সিদ্দীকের মেয়ে! এর অর্থ হচ্ছে এমন লোক, যে নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় এবং মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।"

এ জবাব থেকে জানা যায় যে, আয়াতের সঠিক পাঠ ياتون নয় বরং يُوْتُوْنَ এবং এ يوتون শুধু অর্থ–সম্পদ দান করার সীমিত অর্থে নয় বরং আনুগত্য করার ব্যাপক অর্থে।

একজন মু'মিন কোন্ ধরনের মানসিক অবস্থা সহকারে আল্লাহর বন্দেগী করে এ আয়াতটি তা বর্ণনা করে। হযরত উমরের (রা) অবস্থাই এর পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে। তিনি সারা জীবনের অতুলনীয় কার্যক্রমের পর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকেন তখন আল্লাহর জবাবদিহির ভয়ে ভীত হতে থাকেন এবং বলে যেতে থাকেন, যদি আখেরাতে সমান সমান হয়ে মুক্তি পেয়ে যাই তাহলেও বাঁচোয়া। হযরত হাসান বাসরী (র) বড়ই চমৎকার বলেছেন ঃ মু'মিন আনুগত্য করে এরপরও ভয় করে এবং মুনাফিক গোনাহ করে তারপরও নির্ভীক ও বেপরোয়া থাকে।

৫৪(ক). উল্লেখ্য, ৬১ আয়াতের অনুবাদ ৫৭ আয়াতের আগে করা হয়েছে। এখান থেকে ৬২ আয়াতের অনুবাদ শুরু হচ্ছে।

৫৫. এ প্রেক্ষাপটে এ বাক্যটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। একে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আগের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে তারা প্রকৃত কল্যাণ আহরণকারী। কারা অগ্রবর্তী

হয়ে তা অর্জন করে এবং তাদের গুণাবলী কি কি। এ আলোচনার পর সংগে সংগেই একথা বলা হলো, আমি কখনো কাউকে তার সামর্থের বাইরে কষ্ট দেই না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এ চরিত্র, নৈতিকতা ও কার্যক্রম কোন অতিমানবিক জিনিস নয়। তোমাদেরই মতো রক্ত–মাংসের মানুষেরাই এ পথে চলে দেখিয়ে দিচ্ছে। কাজেই তোমরা একথা বলতে পারো না যে, তোমাদের কাছে এমন কোন জিনিসের দাবী জানানো হচ্ছে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তোমরা যে পথে চলছো তার ওপর চলার ক্ষমতা যেমন মানুষের আছে তেমনি তোমাদের নিজেদের জাতির কতিপয় মুমিন যে পথে চলছে তার ওপর চলার ক্ষমতাও মানুষের আছে। এখন এ দু'টি সম্ভাব্য পথের মধ্যে কে কোন্‌টি নির্বাচন করে, শুধুমাত্র তার ওপরই ফায়সালা নির্ভর করে। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করে যদি তোমরা আজ তোমাদের সমস্ত শ্রম ও প্রচেষ্টা অকল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করো এবং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাও তাহলে আগামীতে নিজেদের এ বোকামির দণ্ড নিতেই হবে। সে দণ্ড থেকে এ খোঁড়া অজুহাত তোমাদের বাঁচাতে পারবে না যে, কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছা তোমাদের সামর্থের বাইরে ছিল। তখন এ অজুহাত পেশ করলে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, এ পথ যদি মানুষের সামর্থের বাইরে থেকে থাকে তাহলে তোমাদেরই মতো অনেক মানুষ তার ওপর চলতে সক্ষম হলো কেমন করে?

৫৬. কিতাব বলে এখানে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির এ আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে তৈরী হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি নড়াচড়া এমনকি চিন্তা–ভাবনা ও ইচ্ছা–সংকল্পের প্রত্যেকটি অবস্থা পর্যন্ত তাতে সন্নিবেশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কেই সূরা কাহ্‌ফে বলা হয়েছে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا –

"আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তারপর তোমরা দেখবে অপরাধীরা তার মধ্যে যা আছে তাকে ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! এ কেমন কিতাব, আমাদের ছোট বা বড় এমন কোন কাজ নেই যা এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল সবই নিজেদের সামনে হাজির দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করেন না।" (৪৯ আয়াত)

কেউ কেউ এখানে কিতাব অর্থে কুরআন গ্রহণ করে আয়াতের অর্থ উল্‌টে দিয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ কারোর বিরুদ্ধে এমন কোন দোষারোপ করা হবে না যে জন্য সে মূলত দায়ী নয়। কারোর এমন কোন সৎকাজ গ্রাস করে ফেলা হবে না যার প্রতিদানের সে প্রকৃতপক্ষে হকদার। কাউকে অনর্থক শাস্তি দেয়া হবে না। কাউকে সত্য অনুযায়ী যথার্থ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রাখাও যাবে না।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾

*কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অচেতন।[৫৮] আর তাদের কার্যাবলীও এ পদ্ধতির (যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে) বিপরীত। তারা নিজেদের এসব কাজ করে যেতে থাকবে, অবশেষে যখন আমি তাদের বিলাসপ্রিয়দেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করবো[৫৯] তখন তারা আবার চিৎকার করতে থাকবে[৬০]—এখন বন্ধ করো[৬১] তোমাদের আর্তচিৎকার আমার পক্ষ থেকে এখন কোন সাহায্য দেয়া হবে না। আমার আয়াত তোমাদের শোনানো হতো, তোমরা তো (রসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছন ফিরে কেটে পড়তে,[৬২]*

৫৮. অর্থাৎ যা কিছু তারা করছে, বলছে ও চিন্তা-ভাবনা করছে—এসব কিছু অন্য কোথাও সন্নিবেশিত হচ্ছে এবং কখনো এর হিসেব হবে না, এ ব্যাপারে তারা বেখবর।

৫৯. "مُتْرَفِيْنَ" শব্দের অনুবাদ এখানে করা হয়েছে "বিলাসপ্রিয়"। "মুত্‌রফীন" আসলে এমনসব লোককে বলা হয় যারা পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার থেকে গাফিল হয়ে গেছে। "বিলাসপ্রিয়" শব্দটির মাধ্যমে এ শব্দটির সঠিক মর্মকথা প্রকাশ হয়ে যায়, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে একে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির খায়েশ পূর্ণ করার অর্থে গ্রহণ করা যাবে না বরং বিলাস প্রিয়তার ব্যাপকতার অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

আযাব বলতে এখানে সম্ভবত আখেরাতের আযাব নয় বরং দুনিয়ার আযাবের কথা বলা হয়েছে। জালেমরা দুনিয়ায়ই এ আযাবের মুখোমুখি হয়।

৬০. মূলে جُؤَار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অত্যধিক কষ্টের মধ্যে গরুর মুখ দিয়ে যে আওয়াজ বের হয় তাকে 'জুআর' বলে। এ শব্দটি এখানে নেহাত ফরিয়াদ ও কাতর আর্তনাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং এমন ব্যক্তির আর্তনাদ ও ফরিয়াদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে কোন প্রকার করুণার যোগ্য নয়। এর মধ্যে ব্যাংগ ও তাচ্ছিল্যভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে, "বেশ, এখন নিজের কৃতকর্মের মজা টের পাওয়ার সময় এসেছে, তাই তো জোরে জোরে চিৎকার করছো।"

৬১. অর্থাৎ তখন তাদেরকে একথা বলা হবে।

৬২. অর্থাৎ তাঁর কথা শুনতেই তো প্রস্তুত ছিলে না। তাঁর আওয়াজ কানে পড়ুক এতটুকুও সহ্য করতে না।

مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾

*অহংকারের সাথে তা অগ্রাহ্য করতে, নিজেদের আড্ডায় বসে তার সম্পর্কে গল্প দিতে[৬৩] ও আজেবাজে কথা বলতে।*

*তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি?[৬৪] অথবা সে এমন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?[৬৫] কিংবা তারা নিজেদের রসূলকে কখনো চিনতো না বলেই (অপরিচিত ব্যক্তি হবার কারণে) তাকে অস্বীকার করে?[৬৬] অথবা তারা কি একথা বলে যে, সে উন্মাদ?[৬৭] না, বরং সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সত্যই তাদের অধিকাংশের কাছে অপছন্দনীয়।*

৬৩. মূলে سَامِرًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سمر মানে রাতের বেলা কথাবার্তা বলা, গল্প করা, কথকতা করা ও গল্প-কাহিনী শুনানো। গ্রামীন ও মফস্বল শহরে জীবনে সাধারণত এ রাত্রিকালের গপ্‌সপ্‌ হয় বৈঠক খানায় ও দহলিজে বসে। মক্কাবাসীদের রীতিও এটাই ছিল।

৬৪. অর্থাৎ তাদের এ মনোভাবের কারণ কি? তারা কি এ বাণী বোঝেইনি, তাই একে মানছে না? মোটেই না, কারণ এটা নয়। কুরআন কোন হেঁয়ালি নয়। কোন দুর্বোধ্য ভাষায় কিতাবটি লেখা হয়নি। কিতাবটিতে এমন সব বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয়নি যা মানুষের বোধগম্য নয়। তারা এর প্রত্যেকটি কথা ভালোভাবে বোঝে। এরপরও বিরোধিতা করছে। কারণ তারা একে মানতে চায় না। এমন নয় যে, তারা একে বুঝার চেষ্টা করছে কিন্তু বুঝতে পারছে না তাই মানতে চায় না।

৬৫. অর্থাৎ তিনি কি এমন একটি অভিনব কথা পেশ করছেন যা তাদের কান কোনদিন শুনেনি এবং এটিই তাদের অস্বীকারের কারণ? মোটেই না, কারণ এটাও নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের আসা, কিতাবসহকারে আসা, তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, আখেরাতের জবাবদিহির ভয় দেখানো এবং নৈতিকতার পরিচিত সৎবৃত্তিগুলো পেশ করা, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও এমন নয় যা ইতিহাসে আজ প্রথমবার দেখা দিয়েছে এবং ইতিপূর্বে আর কখনো এসব কথা শুনা যায়নি। তাদের আশপাশের দেশগুলোয় ইরাকে, সিরিয়ায় ও মিসরে নবীর পর নবী এসেছেন। তাঁরা এসব কথাই বলেছেন। এগুলো তারা জানে না এমন নয়। তাদের নিজেদের দেশেই ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এসেছেন। হূদ, সালেহ ও শোআইব আলাইহিমুস সালামও এসেছেন। তাঁদের নাম

আজো তাদের মুখে মুখে। তারা নিজেরাই তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত বলে মানে। তারা একথাও জানে যে, তাঁরা মুশরিক ছিলেন না বরং এক আল্লাহর বন্দেগীর শিক্ষা দিতেন। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্বীকারের কারণ এই নয় যে, তারা এমন একটি পুরোপুরি আনকোরা নতুন কথা শুনছে যা ইতিপূর্বে কখনো শোনেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন আল ফুরকান, ৮৪; আস্ সাজ্দাহ, ৫ ও সাবা ৩৫ টীকা)।

৬৬. অর্থাৎ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে তারা কোনদিনই জানতো না, হঠাৎ তাদের মধ্যে এসে পড়েছেন এবং বলছেন আমাকে মেনে নাও, এটাই কি তাদের অস্বীকারের কারণ? না, একথা মোটেই নয়। যিনি এ দাওয়াত পেশ করছেন তিনি তাদের নিজেদের গোত্রের ও ভ্রাতৃসমাজের লোক। তাঁর বংশগত মর্যাদা তাদের অজানা নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তদের চোখের আড়ালে নেই। তিনি তাদের সামনেই শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। তাঁর সততা, সত্যতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও নিষ্কলুষ চরিত্র সম্পর্কে তারা খুব ভালোভাবেই জানে। তারা নিজেরাই তাঁকে আমীন বলতো। তাদের সমগ্র ভ্রাতৃসমাজ তাঁর বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করতো। তার নিকৃষ্টতম শত্রুও একথা স্বীকার করে যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। সমগ্র যৌবনকালেই তিনি ছিলেন পূতপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী। সবাই জানে তিনি একজন অত্যন্ত সৎ, ভদ্র ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সত্যসেবী ও শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকেন। পরিচ্ছন্ন লেনদেন করেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাঁর জুড়ি নেই। নিজে জুলুম করেন না এবং জালেমদের সাথে সহযোগিতাও করেন না। কোন হকদারের হক আদায় করতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হননি। প্রত্যেক বিদপগ্রস্ত, অভাবী ও অসহায়ের জন্য তাঁর দরজা হচ্ছে একজন দয়ার্দ্রচিত্ত, স্নেহ পরায়ণ সহানুভূতিশীলের দরজা। তারপর তারা এও জানতো যে, নবুওয়াতের দাবীর একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি কোন দাবী করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর যেদিন তিনি দাবী করেন তার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একই কথা বলে আসছেন। তিনি কোন মোড় পরিবর্তন করেননি বা ডিগবাজী খাননি। নিজের দাওয়াত ও দাবীর মধ্যে কোন রদবদল করেননি। তাঁর দাবীর মধ্যে এমন কোন পর্যায়ক্রমিক ক্রমবিকাশ দেখা যায়নি যার ফলে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, ধীরে ধীরে পা শক্ত করে দাবীর ময়দানে এগিয়ে চলার কাজ চলছে। আবার তাঁর জীবন যাপন প্রণালী সাক্ষ দিচ্ছে যে, অন্যদেরকে তিনি যা কিছু বলেন, তা সবার আগে নিজে পালন করে দেখিয়ে দেন। তাঁর কথায় ও কাজে বৈপরীত্য নেই। তাঁর কাছে হাতির দাঁত নেই, যা দেখাবার জন্য এক রকম এবং খাবার জন্য আবার অন্য রকম। তিনি নেবার জন্য এক পাল্লা এবং দেবার জন্য ভিন্ন পাল্লা ব্যবহার করেন না। এ ধরনের সুপরিচিত ও সুপরীক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে তারা একথা বলতে পারে না যে, "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। বড় বড় প্রতারক আসে এবং হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় কথা বলে প্রথম প্রথম আসর জমিয়ে ফেলে, পরে জানা যায় সবই ছিল ধোঁকা। এ ব্যক্তিও কি জানি আসলে কি এবং বানোয়াট পোশাক আশাক নামিয়ে ফেলার পর ভেতর থেকে কে বের হয়ে আসে কি জানি। তাই একে মেনে নিতে আমাদের মনে সংশয় জাগছে।" (এ প্রসংগে আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, ২১; ইউনুস, ২১ ও বনী ইসরাঈল, ১০৫ টীকা)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ۝٧١ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ۝٧٢ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٧٣ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُونَ ۝٧٤

*—আর সত্য যদি কখনো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যের সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ওলট পালট হয়ে যেতো[৬৮]—না, বরং আমি তাদের নিজেদের কথাই তাদের কাছে এনেছি এবং তারা নিজেদের কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।[৬৯]*

*তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছো? তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন, সেটাই ভালো এবং তিনি সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।[৭০] তুমি তো তাদেরকে সহজ সরল পথের দিকে ডাকছো, কিন্তু যারা পরকাল স্বীকার করে না তারা সঠিক পথ থেকে সরে ভিন্ন পথে চলতে চায়।[৭১]*

৬৭. অর্থাৎ তাদের অস্বীকার করার কারণ কি এই যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল মনে করে? মোটেই না, এটাও আসলে কোন কারণই নয়।

কারণ মুখে তারা যাই বলুক না কেন মনে মনে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়ে চলছে। তাছাড়া একজন পাগল ও সুস্থ-সচেতন ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য এমন কোন অস্পষ্ট বিষয় নয় যে, উভয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। একজন হঠকারী ও নির্লজ্জ ব্যক্তি ছাড়া কে এ বাণী শোনার পর একথা বলতে পারে যে, এটা একজন পাগলের প্রলাপ এবং এ ব্যক্তির জীবনধারা দেখার পর এ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে যে, এটা একজন বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্মাদের জীবন? বড়ই অদ্ভুত সেই পাগলামি (অথবা পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ অনুযায়ী মৃগীরোগীর সংজ্ঞাহীনতা) যার মধ্যে মানুষের মুখ দিয়ে কুরআনের মতো অলৌকিক সৌন্দর্যময় বাণী বের হয়ে আসে এবং যার মাধ্যমে মানুষ একটি আন্দোলনের এমন সফল পথনির্দেশনা দেয় যার ফলে কেবলমাত্র নিজের দেশেরই নয়, সারা দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৬৮. এ ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে একটি অনেক বড় কথা বলা হয়েছে। এটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ায় সাধারণত অজ্ঞ মূর্খ লোকদের নিয়ম এই হয়ে

থাকে যে, তাদের সামনে যে ব্যক্তি সত্য কথাটি বলে দেয় তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। প্রকারান্তরে তারা যেন বলতে চায়, যা সত্য ও বাস্তব সম্মত তা না বলে তাদের মনের মতো কথা বলা হোক। অথচ কেউ পছন্দ করুক বা না করুক সত্য সব অবস্থায়ই সত্য থাকে। সারা দুনিয়ার লোকেরা এক জোট হলেও সত্য ও বাস্তবতাকে এক এক ব্যক্তির ইচ্ছা ও বাসনা অনুযায়ী ঢেলে বের করে আনা এবং প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বিপরীতমুখী বাসনার সাথে একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা কোন বাস্তব ঘটনাকে অবাস্তব এবং সত্যকে অসত্যে পরিণত করাও সম্ভবপর নয়। নির্বুদ্ধিতায় আক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তি কখনো একথা চিন্তা করার প্রয়োজনই বোধ করে না যে, সত্য ও তাদের বাসনার মধ্যে যদি বিরোধ থাকে তাহলে এ দোষটা সত্যের নয় বরং তাদের নিজেদের। তার বিরোধিতা করে তারা তার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না বরং নিজেদেরই ক্ষতি করবে। বিশ্ব–জাহানের এ বিশাল ব্যবস্থা যেসব অবিচল সত্য ও আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তার ছত্রছায়ায় বাস করে মানুষের জন্য নিজের চিন্তা, বাসনা ও কর্মপদ্ধতিকে সত্য অনুযায়ী তৈরী করে নেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা করতে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কেবলমাত্র একজন নির্বোধই এখানে যা কিছু সে বোঝে বা যা কিছু হয়ে যাক বলে তার মন চায় অথবা নিজের বিদ্বিষ্ট মনোভাবের কারণে যা কিছু হয়েছে বা হওয়া উচিত বলে সে ধারণা করে নিয়েছে তার ওপর দ্বিধাহীন হয়ে যাওয়া এবং তার বিরুদ্ধে কারোর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ন্যায়সংগত যুক্তি–প্রমাণও শুনতে প্রস্তুত না হওয়ার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

৬৯. এখানে 'কথা' শব্দটির তিনটি অর্থ হওয়া সম্ভব এবং তিনটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

(ক) 'কথা' প্রকৃতির বর্ণনা অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, আমি অন্য কোন জগতের কথা বলছি না। বরং তাদের নিজেদেরই সত্য ও প্রকৃতি এবং তার দাবী–দাওয়া তাদের সামনে পেশ করছি, যাতে তারা নিজেদের এ ভুলে যাওয়া পাঠ মনে করতে পারে। কিন্তু তারা এটা গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছে। তাদের এ পলায়ন কোন অসংশ্লিষ্ট জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কথা থেকে।

(খ) 'কথা' উপদেশ অর্থে। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যা কিছু পেশ করা হচ্ছে তা তাদেরই ভালোর জন্য একটি উপদেশ এবং তাদের এ পলায়ন অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই কল্যাণের কথা থেকে।

(গ) 'কথা' সম্মান ও মর্যাদা অর্থে। এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমরা এমন জিনিস তাদের কাছে এনেছি যা তারা গ্রহণ করলে তারাই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে। এ থেকে তাদের এ মুখ ফিরিয়ে নেয়া অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই উন্নতি এবং নিজেদেরই উত্থানের একটি সুবর্ণ সুযোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর।

৭০. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে আর একটি প্রমাণ। অর্থাৎ নিজের এ কাজে আপনি পুরোপুরি নিস্বার্থ। কোন ব্যক্তি সততার সাথে এ দোষারোপ করতে পারে না যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আপনার সামনে রয়েছে তাই আপনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে আপনার ভালোই উন্নতি হচ্ছিল।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِیْ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ۝٧٥
وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا یَتَضَرَّعُوْنَ ۝٧٦
حَتّٰۤی اِذَا فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِیْدٍ اِذَا هُمْ فِیْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝٧٧

*যদি আমি তাদের প্রতি করুণা করি এবং বর্তমানে তারা যে দুঃখ–কষ্টে ভুগছে তা দূর করে দেই, তাহলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার স্রোতে একেবারেই ভেসে যাবে।[৭২] তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদেরকে দুঃখ–কষ্টে ফেলে দিয়েছি, তারপরও তারা নিজেদের রবের সামনে নত হয়নি এবং বিনয় ও দীনতাও অবলম্বন করে না। তবে যখন অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, আমি তাদের জন্য কঠিন আযাবের দরজা খুলে দেবো তখন অকস্মাত তোমরা দেখবে যে, এ অবস্থায় তারা সকল প্রকার কল্যাণ থেকে হতাশ হয়ে পড়েছে।[৭৩]*

এখন দারিদ্র ও অর্থসংকটের সম্মুখীন হলেন। জাতির মধ্যে আপনাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। লোকেরা মাথায় করে রাখতো। এখন গালাগালি ও মার খাচ্ছেন বরং প্রাণ নাশের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। নিজের পরিবার–পরিজন নিয়ে নিশ্চিন্তে সুখে জীবন যাপন করছিলেন। এখন এমন একটি কঠিন দ্বন্দ্ব–সংঘাতের মধ্যে পড়ে গেছেন যার ফলে এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস ফেলতে পারছেন না। এর ওপর আরো সমস্যা হলো এমন বিষয় নিয়ে সামনে এসেছেন যার ফলে সারা দেশের লোক শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি নিজের জ্ঞাতি ভাইরা আপনাকে হত্যা করার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে। কে বলতে পারে, এটা একজন স্বার্থবাদী লোকের কাজ? স্বার্থবাদী লোক তো নিজের জাতি ও গোত্রপ্রীতির ঝাণ্ডা উঁচিয়ে নিজের যোগ্যতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভ করার প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি কখনো এমন কোন বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হতেন না যা কেবলমাত্র সমগ্র জাতীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থপ্রীতির বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জই নয় বরং আরবের মুশরিকদের মধ্যে তার গোত্রের সরদারী যে জিনিসের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে তার শিকড়ও কেটে দেয়। এটি এমন একটি যুক্তি যা কুরআনে শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নয় বরং সাধারণভাবে সকল নবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বারবার পেশ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল আন'আম, ৯০; ইউনুস, ৭২; হূদ, ২৯ ও ৫১; ইউসুফ, ১০৪; আল ফুরকান, ৫৭; আশ্ শু'আরা, ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৫ ও ১৮০; সাবা ৪৭; ইয়াসীন, ২১; সাদ, ৮৬; আশ্শূরা, ২৩ ও আন্ নাজম্, ৪০ আয়াত এবং এই সংগে টীকাগুলোও দেখুন।

৭১. অর্থাৎ আখেরাত অস্বীকার করার ফলে তারা দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং দায়িত্বের অনুভূতি না থাকায় তারা একেবারেই বেপরোয়া হয়ে গেছে। তাদের এ জীবনের একটা সমাপ্তি ও ফলাফল যে আছে এবং কারোর সামনে এ সমগ্র জীবনকালের

কার্যাবলীর হিসেব যে দিতে হবে, এটাই যখন তারা বুঝে না, তখন সত্য কি ও মিথ্যা কি তা নিয়ে তাদের কিইবা চিন্তা হতে পারে? জন্তু–জানোয়ারের মতো দেহ ও প্রবৃত্তির প্রয়োজন খুব ভালোভাবে পূর্ণ হতে থাকুক এটিই হয় তাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পর সত্য ও মিথ্যার আলোচনা তাদের কাছে নেহাতই অর্থহীন। আর এ উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি দেখা দিলে বড় জোর তারা এ ত্রুটির কারণ কি এবং কিভাবে একে দূর করা যায় এতটুকুই চিন্তা করবে। এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা কোন দিন সঠিক পথ চাইতে পারে না এবং পেতেও পারে না।

৭২. দুর্ভিক্ষের কারণে আরববাসী যে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে অবস্থান করছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করতে গিয়ে কেউ কেউ দু'টি দুর্ভিক্ষকে এক সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। এর ফলে এটি হিজরতের আগের না পরের ঘটনা তা বুঝা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। আসল ঘটনা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মক্কাবাসীরা দুবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। একবার নবুওয়াতের সূচনার কিছুদিন পর। দ্বিতীয়বার হিজরাতের কয়েক বছর পর যখন সামামাহ ইবনে উসাল ইয়ামামাহ থেকে মক্কার দিকে খাদ্য শস্য রফতানী করা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখানে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষটির নয় প্রথমটির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যখন কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত অস্বীকার করতেই থাকলো এবং কঠোরভাবে বাধা দিতে শুরু করলো তখন তিনি দোয়া করলেন ঃ

اللهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف

"হে আল্লাহ! এদের মোকাবিলায় ইউসুফের সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মতো সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।"

ফলে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেলো যে, মৃতের গোশ্‌ত খাওয়ার ঘটনাও ঘটলো। মক্কী সূরাগুলোতে বহু জায়গায় এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন সূরা আল আন'আম, ৪২ থেকে ৪৪; আল আ'রাফ, ৯৪ থেকে ৯৯; ইউনুস, ১১, ১২, ২১; আন নহল, ১১২, ১১৩ ও আদ্ দুখান, ১০ থেকে ১৬ আয়াত এবং এ সংগে সংশ্লিষ্ট টীকাগুলোও।

৭৩. মূলে مُبْلِسُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হতাশা শব্দটি এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। اِبْلَاس ও بَلَس শব্দের কয়েকটি অর্থ হয়। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া, ভয়ে ও আতংকে নিথর হয়ে যাওয়া, দুঃখে ও শোকে মনমরা হয়ে যাওয়া, সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে সাহস হারিয়ে ফেলা এবং এরি একটি দিক হতাশা ও ব্যর্থতার ফলে মরিয়া (Desperate) হয়ে ওঠা। এ কারণেই শয়তানের নাম ইবলিস রাখা হয়েছে। এ নামের মধ্যে যে অর্থ প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হলো, হতাশা ও নিরাশার (Frustration) ফলে তার আহত অহমিকা এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, এখন সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মরণ খেলায় নামতে এবং সব ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨١﴾ قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾

*৫ রুকূ'*

*তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন এবং চিন্তা করার জন্য অন্তঃকরণ দিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কমই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকো।[৭৪] তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা একত্র হবে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন, দিন রাতের আবর্তন তাঁরই শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন।[৭৫] একথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না?[৭৬] কিন্তু তারা সে একই কথা বলে যা তাদের পূর্বের লোকেরা বলেছিল। তারা বলে, "যখন আমরা মরে মাটি হয়ে যাবো এবং অস্থি পঞ্জরে পরিণত হবো তখন কি আমাদের পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে? আমরা এ প্রতিশ্রুতি অনেক শুনেছি এবং আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ–দাদারাও শুনে এসেছে। এগুলো নিছক পুরাতন কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৭৭]*

*তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ যদি তোমরা জানো তাহলে বলো এ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বাস করে তারা কারা?*

৭৪. এর অর্থ হচ্ছে, হতভাগারা। এ চোখ, কান, মন ও মস্তিষ্ক তোমাদের কি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, পশুরা এদেরকে যেসব কাজে লাগায় তোমরাও এদেরকে সেসব কাজে লাগাবে। তোমরা কেবল পশুদের মতো দেহ ও প্রবৃত্তির দাবী পূরণ করার উপায় তালাশ করতে এবং সবসময় নিজের জীবনমান উন্নত করার কৌশল চিন্তা করতে থাকবে, এগুলোর উপযোগিতা কি শুধু এতটুকুই? তোমাদের মানুষ হিসেবে তৈরী করা

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۷﴾

*তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহর। বলো, তাহলে তোমরা সচেতন হচ্ছো না কেন?*[৭৮] *তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।*[৭৯] *বলো, তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন?*[৮০]

হয়েছিল কিন্তু তোমরা নিছক পশু হয়ে রইলে, এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা কি আর কিছু হতে পারে? যেসব চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা যায় কিন্তু শুধুমাত্র সত্যের দিকে পথ নির্দেশক চিহ্নগুলো দেখা যায় না, যেসব কান দিয়ে সবকিছু শোনা যায় কিন্তু একটি শিক্ষণীয় কথাই শুধু শোনা যায় না, যে মন–মস্তিষ্ক দিয়ে সবকিছু চিন্তা করা যায় কিন্তু শুধু এটুকু চিন্তা করা যায় না যে, আমি এ অস্তিত্ব কেমন করে লাভ করলাম, কেন লাভ করলাম এবং আমার জীবনের লক্ষ কি, সেসব চোখ, কান ও মন–মগজ যদি একটি গরুর পরিবর্তে একটি মানুষের দেহ কাঠামোতে অবস্থান করে তাহলে অবশ্যই আফসোস করতে হয়।

৭৫. জ্ঞানের উপকরণগুলো (ইন্দ্রিয়সমূহ ও চিন্তাশক্তি) ও তাদের সঠিক প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর এখন কতকগুলো নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নিদর্শন খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হলে প্রত্যক্ষ করার পর সঠিকভাবে যুক্তি প্রদান করা হলে অথবা কান খোলা রেখে কোন ন্যায়সংগত যুক্তির কথা শোনা হলে মানুষ সত্যে পৌঁছে যেতে পারে। সে সাথে একথাও জানতে পারে যে, এ অস্তিত্ব জগতটি খোদা বিহীন অথবা বহু খোদার নির্মিত নয়। বরং এটি তাওহীদের তথা একক আল্লাহর সৃষ্টির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর একথাও জানতে পারে যে, এটি উদ্দেশ্যহীন নয়, নিছক খেলা–তামাসা ও একটি অর্থহীন তেলেসমাতিও নয় বরং এ একটি বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মানুষের মতো স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন জীবের পক্ষে নিজের যাবতীয় কর্মের জবাবদিহি না করে মরে যাওয়ার পর এমনি এমনিই মাটিতে মিশে গিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

৭৬. মনে রাখতে হবে, এখানে তাওহীদ ও মৃত্যু পরের জীবন সম্পর্কে এক সাথে যুক্তি প্রদান করা হচ্ছে এবং সামনের দিকে যেসব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেগুলো থেকে শিরক ও আখেরাত অস্বীকৃতি বাতিল হওয়া সম্পর্কে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে।

৭৭. মনে রাখতে হবে, তাদের আখেরাতকে অসম্ভব মনে করা কেবলমাত্র আখেরাতেরই অস্বীকৃতি ছিল না, আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞানেরও অস্বীকৃতি ছিল।

৭৮. অর্থাৎ তাহলে একথা বোঝ না কেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ বন্দেগী লাভের অধিকারী নয় এবং তাঁর পক্ষে পৃথিবীর এই জনবসতিকে পুনর্বার সৃষ্টি করাও কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

*তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো, কার কর্তৃত্ব[৮১] চলছে প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ বিষয়টি তো আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত। বলো, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো কোথায় থেকে?[৮২] যা সত্য তা আমি তাদের সামনে এনেছি এবং এরা যে মিথ্যেবাদী এতে কোন সন্দেহ নেই।[৮৩] আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত করেননি[৮৪] এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো। এবং তারপর তারা একজন অন্যজনের ওপর চড়াও হতো।[৮৫] এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র। প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু তিনি জানেন।[৮৬] এরা যে শিরক নির্ধারণ করে তিনি তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।*

৭৯. মূলে لِلّٰهِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ "এসব জিনিসও আল্লাহর" তবে অনুবাদে নিছক আমাদের ভাষায় সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বাকরীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

৮০. অর্থাৎ তাহলে কেন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করতে ভয় করো না? কেন তোমরা এ ভয় করো না, আকাশ ও পৃথিবীর বাদশাহ যদি কখনো আমাদের কাছ থেকে হিসেব নেন তাহলে আমরা তাঁর কাছে কি জবাব দেবো?

৮১. মূলে مَلَكُوْتُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে مُلْك (বাদশাহী) ও مِلْك (মালিকানা) উভয়েরই অর্থ। আর এর সংগে রয়েছে চরম আতিশয্যের অর্থও। এ বিস্তারিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে আয়াতে পেশকৃত প্রশ্নের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ঃ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব কার এবং প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর পুরোপুরি মালিকানা ক্ষমতা আছে কার হাতে?"

৮২. মূলে আছে দু'টি শব্দ أَنَّىٰ تُسْحَرُونَ-এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "কোথায় থেকে তোমরা যাদুকৃক হচ্ছো ?" যাদু ও তেলেসমাতের স্বরূপ এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, একটি জিনিসকে তার আসল অর্থ, তাৎপর্য ও সঠিক চেহারার বিপরীতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং দর্শকের মনে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি করে যে, যাদুকর কৃত্রিমভাবে যা পেশ করছে তা-ই হচ্ছে ঐ জিনিসের আসল স্বরূপ। কাজেই আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, কে তোমাদের ওপর এমন যাদু করে দিয়েছে যার ফলে এসব কথা জানা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্য তোমরা বুঝতে পারছো না ? কার যাদু তোমাদেরকে এমন উদভ্রান্ত করে দিয়েছে, যার ফলে যে মালিক নয় তাকে তোমরা মালিক বা তার শরীক হিসেবে দেখছো এবং যারা কোনো কর্তৃত্বের অধিকারী নয় তাদেরকে তোমরা আসল কর্তৃত্বের অধিকারীর মতো বরং তাঁর চাইতেও বেশী বন্দেগীর হকদার মনে করছো ? কে তোমাদের চোখে আবরণ দিয়েছে, যার ফলে যে আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা একথা স্বীকার করো যে, তাঁর মোকাবিলায় কোনো আশ্রয়দাতা নেই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো এবং যারা তাঁর হাত থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে না তাদের আশ্রয়ের ওপর ভরসা করছো ? কে তোমাদেরকে এ প্রতারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক তিনি তোমাদেরকে তাঁর জিনিসগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছো সেকথা কখনো জিজ্ঞেস করবেন না এবং যিনি সারা বিশ্ব-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি কখনো তোমাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না যে, তাঁর রাজত্বের মধ্যে তোমরা নিজেদের রাজত্ব চালাবার অথবা অন্যদের রাজত্ব মেনে নেবার অধিকার কোথায় থেকে লাভ করলে ? কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যাদুর অভিযোগ এনেছিল এ বিষয়টি যদি সামনে থাকে তাহলে প্রশ্নের ধরন আরো বেশী অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে প্রশ্নের এ শব্দাবলীর মধ্যে এ বিষয়বস্তুটিও ফুটে উঠেছে যে, নির্বোধের দল! যিনি তোমাদেরকে আসল সত্যটি (তোমাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী যার আসল সত্য হওয়া উচিত) বলেন, তিনি তো তোমাদের চোখে যাদুকর আর যারা রাতদিন তোমাদেরকে সত্য বিরোধী কথা বলে বেড়ায় এমনকি যারা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বিরোধী, তোমাদের নিজেদের স্বীকৃত সত্য বিরোধী প্রকাশ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাসী করে দিয়েছে তারাই যে আসল যাদুকর তাদের সম্পর্কে তোমাদের মনে কখনো এ সন্দেহ জাগে না।

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার (আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার অথবা সেগুলোর কোন অংশ) অধিকারী নিজেদের একথায় তারা মিথ্যেবাদী। আর মৃত্যুর পর পুর্নবার জীবন সম্ভব নয়, একথায়ও মিথ্যেবাদী। তাদের মিথ্যা তাদের নিজেদের স্বীকৃতিগুলো থেকে প্রমাণিত। একদিকে আল্লাহকে পৃথিবী ও আকাশের মালিক ও সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাশালী বলে মেনে নেয়া এবং অন্যদিকে একথা বলা যে, তিনিই একমাত্র সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী নন বরং অন্যদেরও (যারা অনিবার্যভাবে তাঁর অধীনই হবে) তাতে কোন অংশ আছে, এ দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে পরস্পর বিরোধী। অনুরূপভাবে একদিকে আমাদেরকে ও এ বিশাল বিশ্ব-জাহানকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বলে স্বীকার করা এবং অন্যদিকে আল্লাহ তাঁর নিজেরই তৈরী করা সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে পারেন না বলে দাবী করা একেবারেই বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী কথা। কাজেই তাদের মেনে নেয়া সত্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, শিরক করা ও আখেরাত অস্বীকার করা দু'টোই তাদের অবলম্বিত মিথ্যা বিশ্বাস।

৮৪. এখানে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে বসেন যে, নিছক খৃষ্টবাদের প্রতিবাদে একথা বলা হয়েছে। না, আরবের মুশরিকরাও নিজেদের উপাস্যদেরকে আল্লাহর সন্তান গণ্য করতো। এ ভ্রষ্টতার ব্যাপারে দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিক ছিল তাদের সহযোগী। যেহেতু খৃষ্টানদের "খোদার পুত্র" আকীদাটির প্রচার বেশী হয়ে গেছে তাই কোন কোন শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সিরও এ ভুল ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, এ আয়াতটি তারই প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে। অথচ শুরু থেকেই মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই থেকেছে সমগ্র ভাষণটির মূল লক্ষ। এ প্রেক্ষাপটে হঠাৎ বক্তব্য খৃষ্টানদের দিকে মোড় নেয়ার কোন অর্থই হয় না। তবে আনুসংগিকভাবে এর মধ্য দিয়ে খৃষ্টান–মুশরিক নির্বিশেষে যারাই আল্লাহর সাথে নিজেদের উপাস্য ও নেতাদের বংশধারা মিলিয়ে দেয় তাদের সবার আকীদা–বিশ্বাসের খণ্ডন হয়ে যায়।

৮৫. অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন শক্তির ও বিভিন্ন অংশের স্রষ্টা ও প্রভু হতো আলাদা আলাদা ইলাহ এবং এরপরও তাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় থাকতো যেমন তোমরা এ সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার অসংখ্য শক্তি ও বস্তু এবং অগণিত গ্রহ–নক্ষত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছো, এটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। বিশ্ব–জাহানের নিয়ম শৃংখলা ও তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক একাত্মতা স্পষ্টতই প্রমাণ করছে যে, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একজন একক আল্লাহর হাতে কেন্দ্রীভূত। যদি কর্তৃত্ব বিভক্ত হতো তাহলে কর্তৃত্বশীলদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। আর এ মতবিরোধ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ পর্যন্ত না পৌঁছে ছাড়তো না। এ বক্তব্যই সূরা আম্বিয়ায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

"যদি পৃথিবী ও আকাশে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ থাকতো তাহলে এ উভয়ের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।" (২২ আয়াত)

সূরা বনী ইসরাঈলেও এ একই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে ঃ

لَوْ كَانَ مَعَهُ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لاَّبْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلاً

"যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো, যেমন লোকেরা বলে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আরশের মালিকের স্থানে পৌঁছুবার চেষ্টা করতো।"

(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন বনী ইসরাঈল, ৪৭ এবং আল আম্বিয়া, ২২ টীকা)।

৮৬. কোন কোন সমাজে একটা বিশেষ ধরনের শিরক দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রাথমিক রূপ হলো শাফায়াত বা সুপারিশ করে পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষমতা সংক্রান্ত মুশরিকী আকীদা। তারপর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য কোন কোন সত্তার অদৃশ্য ও ভূত–ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে ধারণা করা।

এখানে এ বিশেষ ধরনের শিরকের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে, আয়াতটি এ শিরকের উভয় দিককে খণ্ডন করে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ত্বা–হা, ৮৫ ও ৮৬ এবং আল আম্বিয়া, ২৭ টীকা)।

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۭ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৬ রুকূ'

*হে মুহাম্মাদ (সা)! দোয়া করো, "হে আমার রব! এদেরকে যে আযাবের হুমকি দেয়া হচ্ছে, তুমি যদি আমার উপস্থিতিতে সে আযাব আনো তাহলে হে পরওয়ারদিগার! আমাকে এ জালেমদের অন্তরভুক্ত করো না।*[৮৭] *আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার চোখের সামনে আমার সে জিনিস আনার পূর্ণ শক্তি আছে যার হুমকি আমি তাদেরকে দিচ্ছি।*

*হে মুহাম্মাদ (সা)! মন্দকে দূর করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তারা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বলে তা আমি খুব ভালো করেই জানি। আর দোয়া করো, হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। এমনকি হে পরওয়ারদিগার, সে আমার কাছে আসুক এ থেকেও তো আমি তোমার আশ্রয় চাই।*[৮৮]

৮৭. এর অর্থ এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আইলাহি ওয়া সাল্লামের ওপরও সে আযাব আসার কোন আশংকা ছিল অথবা তিনি দোয়া না চাইলে তাঁর ওপর এ আযাব এসে যেতো। বরং এ ধরনের বর্ণনাভংগী অবলম্বন করা হয়েছে কেবল এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য যে, আল্লাহর আযাব অবশ্যি ভয় করার মতো জিনিস। এ আযাব দাবী করে চেয়ে নেবার মতো জিনিস নয় এবং যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও ধৈর্যশীলতার কারণে তা নিয়ে আসতে বিলম্ব করে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তে নাফরমানি ও শয়তানির কাজ করে যেতে থাকাও উচিত নয়। আসলে তা এমন ভয়াবহ জিনিস যে, কেবল গোনাহগারদেরই নয়, নেক্‌কারদেরও নিজেদের সমস্ত নেকী ও সৎকাজ সত্ত্বেও তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত। এছাড়াও এর মধ্যে আর একটি দিকও রয়েছে। অর্থাৎ সামষ্টিক গোনাহর ফলে যখন আযাবের গাড়ি চলতে থাকে তখন তার তলায় কেবল খারাপ লোকরাই পিষ্ট হয় না বরং তাদের সাথে সাথে অনেক সময় ভালো লোকও পিষ্ট হয়ে যায়। কাজেই একটি ভ্রষ্ট ও অসৎ সমাজে বাসকারী প্রত্যেক সৎব্যক্তিকে সবসময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকা উচিত। কেউ জানে না কবে কোন্‌ পরিস্থিতিতে জালেমদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল হতে থাকবে এবং কে তার চাকার তলায় পিষ্ট হবে।

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

*(এরা নিজেদের কৃতকর্ম থেকে বিরত হবে না) এমনকি যখন এদের কারোর মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন বলতে থাকবে, "হে আমার রব ! যে দুনিয়াটা আমি ছেড়ে চলে এসেছি সেখানেই আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও,[৮৯] আশা করি এখন আমি সৎকাজ করবো।[৯০] কখনোই নয়,[৯১] এটা তার প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।[৯২] এখন এ মৃতদের পেছনে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে একটি অন্তরবর্তীকালীন যুগ—বরযখ যা পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত থাকবে।[৯৩]*

৮৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, ৭১ ও ৭২; আল আ'রাফ, ১৩৮ ও ১৫০ থেকে ১৫৩; ইউনুস, ৩৯; আল হিজর, ৪৮; আন নাহল, ১২২ থেকে ১২৪; বনী ইসরাঈল, ৫৮ থেকে ৬৩ এবং হা-মীম আস্ সাজ্দাহ, ৩৬ থেকে ৪১ টীকা।

৮৯. মূলে رَبِّ ارْجِعُوْنِ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহকে সম্বোধন করে বহুবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে আবেদন করার একটি কারণ এ হতে পারে যে, এটি সম্মানার্থে করা হয়েছে যেমন বিভিন্ন ভাষায় এ পদ্ধতির প্রচলন আছে। দ্বিতীয় কারণ কেউ কেউ এও বর্ণনা করেছেন যে, আবেদনের শব্দ বারবার উচ্চারণ করার ধারণা দেবার জন্য এভাবে বলা হয়েছে। যেমন তা اِرْجِعْنِىْ اِرْجِعْنِىْ اِرْجِعْنِىْ (আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও) এর অর্থ প্রকাশ করে। এ ছাড়া কোন কোন মুফাস্সির এ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, رَبِّ সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহকে এবং ارْجِعُوْنِ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব ফেরেশতাদেরকে যারা সংশ্লিষ্ট অপরাধী আত্মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কথাটি এভাবে বলা হয়, "হায়! আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠাও।"

৯০. কুরআন মজীদের বহু জায়গায় এ বক্তব্যটি উচ্চারিত হয়েছে। অপরাধীরা মৃত্যুর সীমানায় প্রবেশ করার সময় থেকে নিয়ে আখেরাতে প্রবেশ করে জাহান্নামে দাখিল হওয়া পর্যন্ত বরং তার পরও বারবার এ আবেদনই করতে থাকবে ঃ আমাদের আর একবার মাত্র দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হোক। এখন আমরা তাওবা করছি, আর কখনো নাফরমানি করবো না, এবার আমরা সোজা পথে চলবো। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সূরা আল আন'আম, ২৭ ও ২৮; আল আ'রাফ, ৫৩; ইবরাহীম, ৪৪ ও ৪৫; আল মু'মিনূন, ১০৫ থেকে ১১৫; আশ শু'আরা, ১০২; আস সাজ্দাহ, ১২ থেকে ১৪; ফাতের, ৩৭; আয্ যুমার, ৫৮ ও ৫৯; আল মু'মিন, ১০ থেকে ১২ ও আশ্ শূরা, ৪৪ আয়াত এবং এ সংগে টীকাগুলোও)।

৯১. অর্থাৎ ফেরত পাঠানো হবে না। নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য তাকে আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, মানুষকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

*তারপর যখনই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেসও করবে না।[৯৪] সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে[৯৫] তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।[৯৬] তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। আগুন তাদের মুখের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের চোয়াল বাইরে বের হয়ে আসবে।[৯৭] —"তোমরা কি সেসব লোক নও যাদের কাছে আমার আয়াত শুনানো হলেই বলতে এটা মিথ্যা?"*

করার জন্য পুনরায় যদি এ দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় তাহলে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। মৃত্যুর পর সে যা কিছু করেছে সেসব তার স্মৃতি ও চেতনায় সংরক্ষিত করে রাখতে হবে। অথবা এসব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে প্রথমবার যেমন স্মৃতির কোঠা শূন্য করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় আবার তাকে সৃষ্টি করা হবে। উল্লেখিত প্রথম অবস্থায় পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ এ দুনিয়ায় মানুষ সত্যকে প্রত্যক্ষ না করে নিজেই বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে সত্যকে জেনে তাকে মেনে নেয় কিনা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও এ দু'টি পথের মধ্য থেকে কোন্‌টি অবলম্বন করে—এরি ভিত্তিতেই হচ্ছে তার পরীক্ষা। এখন যদি তাকে সত্য দেখিয়েও দেয়া হয় এবং গোনাহের পরিণাম বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে গোনাহকে নির্বাচন করার পথই তার জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে এরপর তাকে পরীক্ষাগৃহে পাঠানোই অর্থহীন হয়ে যায়। এরপর কে ঈমান আনবে না এবং কে আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে? আর দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি পরীক্ষিতকে আবার পরীক্ষা করার মতো অবস্থা। যে ব্যক্তি একবার এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে তাকে আবার সে একই ধরনের আর একটি পরীক্ষায় পাঠানো নিরর্থক। কারণ সে আবার সেই আগের মতোই করবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, ২২৮; আল আন'আম, ৬, ১৩৯ ও ১৪০ এবং ইউনুস, ২৬ টীকা)।

৯২. এ অনুবাদও হতে পারে, "এ তো এখন সে বলবেই।" এর অর্থ হচ্ছে, তার এ কথা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। সর্বনাশ হবার পর এখন সে একথা বলবে না তো আর কি বলবে। এ নিছক কথার কথা। ফিরে আসবে যখন তখন আবার সেসব কিছু করবে যা আগে করে এসেছে। কাজেই তাকে প্রলাপ বকতে দাও ফেরার দরজা তার জন্য খোলা যেতে পারে না।

৯৩. "বরযখ" (بَرْزَخْ) শব্দটি ফার্সী "পরদা" (پَردہ) শব্দটির আরবীকরণ। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এখন তাদের ও দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে একটি প্রতিবন্ধক। এটি তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝখানের এ যবনিকার আড়ালে অবস্থান করবে।

৯৪. এর মানে এ নয় যে, বাপ আর বাপ থাকবে না এবং ছেলে ছেলে থাকবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে সময় বাপ ছেলের কোন কাজে লাগবে না এবং ছেলে বাপের কোন কাজে লাগবে না। প্রত্যেকে এমনভাবে নিজের অবস্থার শিকার হবে যে, একজন অন্যজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তো দূরের কথা কারোর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো চেতনাও থাকবে না। অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا "কোন অন্তরংগ বন্ধু নিজের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না।" (আল মা'আরিজ, ১০ আয়াত)

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ○ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ ○ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ –

"সেদিন অপরাধীর মন তার নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও নিজের সহায়তাকারী নিকটতম আত্মীয় এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে এবং নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করতে চাইবে।" (আল মা'আরিজ, ১১ থেকে ১৪ আয়াত)।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○

"সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থার মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে, তার কারোর কথা মনে থাকবে না।" (আবাসা, ৩৪ থেকে ৩৭)

৯৫. অর্থাৎ যাদের নেক কাজের পাল্লা অসৎকাজের পাল্লা থেকে বেশী ভারী হবে।

৯৬. সূরার শুরুতে এবং তারপর চতুর্থ রুকূ'তে সাফল্য ও ক্ষতির যে মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে তাকে আর একবার মনের মধ্যে চাংগা করে নিন।

৯৭. মূলে كَالِحُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। كَالِحٌ আরবী ভাষায় এমন চেহারাকে বলা হয় যার চামড়া আলাদা হয়ে গেছে এবং দাঁত বাইরে বের হয়ে এসেছে। যেমন খাশির

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾

*তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর ছেয়ে গিয়েছিল, আমরা সত্যিই ছিলাম বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে পরওয়ারদিগার! এখন আমাদের এখান থেকে বের করে দাও, আমরা যদি আবার এ ধরনের অপরাধ করি তাহলে আমরা জালেম হবো।" আল্লাহ জবাব দেবেন, "দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, পড়ে থাকো ওরি মধ্যে এবং কথা বলো না আমার সাথে।[৯৮] তোমরা হচ্ছো তারাই, যখন আমার কিছু বান্দা বলতো, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি করুণা করো, তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল, তখন তোমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে, এমনকি তাদের প্রতি জিদ তোমাদের আমার কথাও ভুলিয়ে দেয় এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে থাকতে। আজ তাদের সে সবরের ফল আমি এই দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।"[৯৯] তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "বলো, পৃথিবীতে তোমরা কত বছর থাকলে?" তারা বলবে, "এক দিন বা দিনেরও কিছু অংশে আমরা সেখানে অবস্থান করেছিলাম,[১০০] গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন।"*

ভুনা মাথা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে (রা) এক ব্যক্তি "কালেহ"–এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : الم تر الى الراس المشيط ؟ অর্থাৎ "তুমি কি ভুনা খাশির কল্লা দেখোনি?"

৯৮. অর্থাৎ নিজের মুক্তির জন্য আবেদন নিবেদন করো না। নিজের ওজর পেশ করো না। চিরকালের জন্য একেবারেই নীরব হয়ে যাও, এ অর্থ নয়। হাদীসের বর্ণনায় বলা হয়েছে,

قٰلَ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا قَلِیۡلًا لَّوۡ اَنَّکُمۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۱۴﴾ اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰکُمۡ عَبَثًا وَّ اَنَّکُمۡ اِلَیۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَی اللّٰہُ الۡمَلِکُ الۡحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡکَرِیۡمِ ﴿۱۱۶﴾ وَ مَنۡ یَّدۡعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰـہًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرۡہَانَ لَہٗ بِہٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُہٗ عِنۡدَ رَبِّہٖ ؕ اِنَّہٗ لَا یُفۡلِحُ الۡکٰفِرُوۡنَ ﴿۱۱۷﴾ وَ قُلۡ رَّبِّ اغۡفِرۡ وَ ارۡحَمۡ وَ اَنۡتَ خَیۡرُ الرّٰحِمِیۡنَ ﴿۱۱۸﴾

*বলবেন, "অল্পক্ষণই অবস্থান করেছিলে, হায়! যদি তোমরা একথা সে সময় জানতে।[১০১] তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি[১০২] এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?"*

*কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ হচ্ছেন উচ্চতর ও উন্নততর,[১০৩] তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের তিনিই মালিক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই,[১০৪] তার হিসেব রয়েছে তার রবের কাছে।[১০৫] এ ধরনের কাফের কখনো সফলকাম হতে পারে না।[১০৬]*

*হে মুহাম্মাদ (সা)! বলো, "হে আমার রব! ক্ষমা করো ও করুণা করো এবং তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল।"[১০৭]*

এ হবে তাদের শেষ কথাবার্তা। এরপর তাদের কন্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু একথা বাহ্যত কুরআন বিরোধী। কারণ সামনের দিকে কুরআন নিজেই তাদের ও আল্লাহর মধ্যকার কথাবার্তা উদ্ধৃত করছে। কাজেই হয় হাদীসের এ বর্ণনা সঠিক নয় অথবা এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এরপর তারা মুক্তির জন্য কোন আবেদন নিবেদন করতে পারবে না।

৯৯. আবার একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ কে হবে সাফল্যের অধিকারী এবং কে ক্ষতির অধিকারী।

১০০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা, ৮০ টীকা।

১০১. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমার নবী ক্রমাগতভাবে তোমাদের বলেছেন যে, দুনিয়ার জীবন নিছক হাতে গোনা কয়েকটি পরীক্ষার ঘন্টা মাত্র। একেই আসল জীবন এবং একমাত্র জীবন মনে করে বসো না। আসল জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সেখানে তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে। এখানকার সাময়িক লাভ ও স্বাদ–আহলাদের লোভে এমন কাজ

করো না যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তোমাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু তখন তোমরা তাঁর কথায় কান দাওনি। তোমরা এ আখেরাতের জগত অস্বীকার করতে থেকেছো। তোমরা মৃত্যুপরের জীবনকে একটি মনগড়া কাহিনী মনে করেছো। তোমরা নিজেদের এ ধারণার ওপর জোর দিতে থেকেছো যে, জীবন–মৃত্যুর ব্যাপারটি নিছক এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে চুটিয়ে মজা লুটে নিতে হবে। কাজেই এখন আর অনুশোচনা করে কী লাভ। তখনই ছিল সাবধান হবার সময় যখন তোমরা দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে এখানকার চিরন্তন জীবনের লাভ বিসর্জন দিচ্ছিলে।

১০২. মূলে عَبَثًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, "খেলাচ্ছলে" এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, "খেলার জন্য"। প্রথম অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, "তোমরা কি মনে করেছিলে, তোমাদেরকে এমনিই খেলাচ্ছলে আমোদ–আহলাদ করতে করতে তৈরী করা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টির কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই, নিছক একটি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি হিসেবে তৈরী করে তোমাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন?" দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, "তোমরা কি একথা মনে করতে যে, তোমাদেরকে নিছক খেলাধূলা, আমোদ– আহলাদ, ফূর্তি ও এমন সব আজেবাজে অর্থহীন কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যেগুলোর কোনদিন কোন ফল হবে না?"

১০৩. অর্থাৎ তিনি কোন বাজে কাজ করার উর্ধে অবস্থান করেন এবং তাঁর কোন বান্দা ও গোলাম তাঁর প্রভুত্বের কার্যক্রমে তাঁর সাথে শরীক হবে এরও অনেক উর্ধে তাঁর অবস্থান।

১০৪. এর দ্বিতীয় অনুবাদ এই হতে পারে ঃ "যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে ডাকে তার জন্য তার নিজের এ কাজের সপক্ষে কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই।

১০৫. অর্থাৎ সে জবাবদিহি ও হিসেব–নিকেশ থেকে রক্ষা পেতে পারে না।

১০৬. আবার সে একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে অর্থাৎ আসলে কে সাফল্য লাভকারী এবং কে তা থেকে বঞ্চিত?

১০৭. এখানে এ দোয়ার সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থ দৃষ্টিসমক্ষে থাকা উচিত। এখনই কয়েক ছত্র ওপরে বলা হয়েছে, আখেরাতে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের দুশমনদেরকে একথা বলে মাফ করে দিতে অস্বীকার করবেন যে, আমার যেসব বান্দা এ দোয়া করতো তোমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করতে। এরপর এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (ও আনুসংগিকভাবে সাহাবায়ে কেরামকেও) এ হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, ঠিক সে একই দোয়া করো যার কথা আমি এইমাত্র বলে এসেছি। আমার পরিষ্কার সতর্কবাণী সত্ত্বেও এখন যদি তারা তোমাকে বিদ্রূপ করতে থাকে তাহলে আখেরাতে যেন তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী মোকদ্দমা তৈরী করে দেবে।

---